প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- আধ্যাত্মিক সফরের বাস্তব নির্দেশনা
  মোহাম্মাদ আলী শোমালী
- নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়
  সংকলন : মো. আশিকুর রহমান
- কুরআন মজিদের কতিপয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি
  কাজেম মুদীর শানেচী
- কুরআন ও জীবনের প্রকৃতি
- মেরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান
- সৃষ্টিতে 'বাদা' প্রসঙ্গ
  আয়াতুল্লাহ আল-উযমা সাইয়্যেদ আবুল কাসেম খুয়ী
- শহীদ মুতাহহারীর দর্শনচিন্তায় মানব জীবনে ধর্মের অবদান
  সংকলন : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
- ইসলামী চিন্তাধারায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি
  মাহদী আবিদান ও রহিম সুরখী

বর্ষ ৫, সংখ্যা ১-২, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৪

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৫, সংখ্যা ১-২

এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৪

সম্পাদক : **এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**

সহযোগী সম্পাদক : **ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**

নির্বাহী সম্পাদক : **মো. আশিফুর রহমান**

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : বৈশাখ-ভাদ্র ১৪২১

জমাদিউস সানী-জিলকদ ১৪৩৫

মূল্য : ১০০ (একশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : ৩৮/এ, ছিন্নমূল শপিং কমপ্লেক্স

(পরিবর্তিত ঠিকানা) মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

Prottasha (Vol. 5, No. 1-2, April-September 2014), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman;

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**

  ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের সাথে পরিচিতি ও অনুসরণই ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষক ৭

- **নীতি-নৈতিকতা**

  আধ্যাত্মিক সফরের বাস্তব নির্দেশনা ১১

  মোহাম্মাদ আলী সোমালী

  নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় ২৭

  সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

- **ধর্ম ও দর্শন**

  কুরআন মজিদের কতিপয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ৪৩

  কাজেম মুদীর শনেচী

  কুরআন ও জীবনের প্রকৃতি ৭২

  শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহ্হারী

  মে'রাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান ৮৪

  সৃষ্টিতে 'বাদা' প্রসঙ্গ ১০৭

  আয়াতুল্লাহ আল-উযমা সাইয়্যেদ আবুল কাসেম আল-খুয়ী

  শহীদ আয়তুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহহারীর দর্শনচিন্তায় মানব জীবনে ধর্মের অবদান ১২৩

  সংকলন : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

- **বিশেষ নিবন্ধ**

  ইসলামী চিন্তাধারায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি ও অবস্থান ১৩৫

  মাহদী আযিযান ও রহিম লুতফী

- **প্রতিক্রিয়া** ১৫৬

- **একজন মহান কোরআন গবেষকের ইন্তেকাল** ১৬০

Prottasha
A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 5, No. 1-2, April-September 2014

Table of Contents

- **Editorial**
  Acquaintance with the Faith and Ideals of Islam and to following those is the Custodian of Islamic Culture **7**
- **Ethics**
  Practical Instructions for Spiritual Journey **11**
  Dr. Mohammad Ali Shomali
  Some Issues Related to Ethics and Morality **27**
  Compilation: Md. Asifur Rahman
- **Theology and Philosophy**
  Some Old Manuscripts of the Holy Quran **43**
  Kazem Mudir Shanechi
  The Quran and Nature of Life **72**
  Shaheed Ayatollah Murtaza Mutahhari
  Meraz and Modern Science **84**
  'Bada' in the Creation **107**
  Ayatollah Al-Uzma Sayyed Abul Qasem Al-Khui
  Role of Religion in the life of Human Being:
  In the Philosophical Thought of Ayatollah Mutahhari **123**
  Compilation: Abdul Quddus Badsha
- **Special Article**
  Acceptance and Position of Cultural Diversity in Islam **135**
  Mahdi Azizan and Rahim Lutfi
- **Reaction** **156**
- **Demise of A Great Researcher of the Holy Quran** **160**

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	১২০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :
মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের সাথে পরিচিতি
ও অনুসরণই ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষক

৬

সম্পাদকীয়

ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের সাথে পরিচিতি ও অনুসরণই ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষক

নিঃসন্দেহে কোন জাতি ও সমাজ তার স্বকীয়তা বজায় রেখে টিকে থাকার জন্য যে উপাদানটি মূখ্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় তা হল সংস্কৃতি। যেহেতু সংস্কৃতি কোন জাতি ও সমাজের সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত মানবিক উপাদানকে-যেমন ধর্ম, ভাষা, জ্ঞান, শিল্পকলা, নৈতিকতা, সামাজিক প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, আদবকায়দা-শামিল করে সেহেতু সংস্কৃতির মধ্যেই সমাজের মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, আবেগ-অনুভূতি, স্বভাব-প্রকৃতি ও আচার-আচরণের প্রতিফলন ঘটে। তাই সংস্কৃতিকে একটি জাতির পরিচয়পত্র বলা যেতে পারে। এ কারণে সকল সমাজও মতাদর্শেরকাছে স্বীয় সংস্কৃতিও সংস্কৃতির উপাদান সমূহ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ইসলাম সর্বশেষ, বিশ্বজনীন ও চিরন্তন এক ধর্ম হিসাবে অনুপমও স্বতন্ত্র একসংস্কৃতিকে ধারণ করছে। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসও জীবনাদর্শ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের সার্বিক জীবনকে ঐশী সহজাত প্রবৃত্তির (ফিতরাত) সাথে সংগতিশীল করে গড়ে তুলতে চায়। শরীয়ত, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকসম্মত নীতিমালার ভিত্তিতে এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা সমাজের মানুষদের জীবনধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

ইসলাম মানুষের জীবনের সকল দিককে পবিত্র ও ন্যায় ভিত্তিক করতে চায়।ইসলামের সকল বিধিবিধানও এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রবর্তিত হয়েছে। যেহেতু ইসলাম মানুষকে পরিবর্তনশীল ও নশ্বর দেহ এবং অবিনশ্বর আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট ঐশী সহজাত প্রবণতাসম্পন্ন এক অস্তিত্ব বলে বিশ্বাস করে সেহেতু তার বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় চাহিদা পূরণের প্রতি দৃষ্টি রেখেছে। কিন্তু মানুষের বস্তুগত ও দৈহিক চাহিদাকে যদি সুস্থ বুদ্ধি বৃত্তি ও উন্নত চিন্তার আবেগ অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত না করা হয় তবে তা পশুত্বের প্রবণতায় পর্যবসিত হয়। তাই তার মানবিক ও আত্মিক পূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য বস্তুগত কামনা-বাসনা ও প্রবণতাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্য পূর্ণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আর এ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে পড়ে তা হলো তওহীদের বিশ্বাসকে মানুষের মধ্যে দৃঢ়মূল করা। মানুষ যখন নিজেকে এক আল্লাহর দাস এবং স্বীয় সত্তাসহ তার আয়ত্তাধীন সকল কিছুকে তাঁর দেয়া আমানতরূপে গণ্য করবে তখন তার মধ্যে এ ঐশী দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে। কারণ মানুষ বিশ্বেও ব্যাপকতা ও নিজের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা থেকে মহান আল্লাহর জ্ঞানের অসীমত্ব এবং নিজেকে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর দিক নির্দেশনার প্রতি মুখাপেক্ষিতার বিষয়টি অনুধাবন করবে।

এ প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে ইসলাম বেশকিছু ব্যবহারিক বিধিবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যেমন - জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের সত্তাগত মর্যাদায় বিশ্বাস এবং তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন,, মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য নামাজ, রোজা, হজপ্রভৃতি বিধান পালন, হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ, হারাম, অপবিত্র ও ক্ষতিকর সকল খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকা, পোশাক, আচরণ ও ভাব ভঙ্গিতে লজ্জা ও শালীনতা বজায় রাখা, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা বর্জন, বৈবাহিক বন্ধনকে সম্মানিত জ্ঞান করে এর সুরক্ষা ও দৃঢ়করণে পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিবারকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরজন্য প্রশিক্ষণ স্থল হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব দান, অশ্লীলকর্ম পরিহার, হিতকর কর্মে নিয়োজিত হওয়া, জুলুম, অবিচার ও অনিষ্টকর কর্ম থেকে দূরে থাকা ও অন্যদের বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালানো (সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ), পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সত্যবাদিতা, সদাচরণ ও বিশ্বস্ততা রক্ষা, সমাজের মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল ও প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকা, নিঃস্বার্থ, আত্মত্যাগী ও সহানুভূতিশীল হওয়া, লোভ, হিংসা ও কপটতা ত্যাগ, কর্মমুখি ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া, অকৃপণ ও মিতব্যয়ী হওয়া, সকলের অধিকার যথাযথ প্রদান করা, খোদামুখি হওয়া, ঐশী ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি নিবেদিত থাকা, ধর্মে পবিত্র বলে গণ্য ব্যক্তিত্ব ও নিদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া,কল্যাণকর জ্ঞান ও শিক্ষার অনুসন্ধান, ক্ষতিকর জ্ঞান ও অশিক্ষা পরিত্যাগ করা, জ্ঞান ও স্বাধীনতাকে সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করা, সর্বজনীনভাবে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়া, চিন্তা ও কর্মে সত্যপরায়ণ হওয়া, আবেগ অনুভূতিকে বুদ্ধি বৃত্তি ও ন্যায়ের অনুগামী করা, অন্যায় ও অসত্যেও বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ, সমাজের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ণে সচেষ্ট হওয়া, বিলাসিতা, ভোগবাদিতা ও অপচয় রোধ করা, অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করা, অনাচার ও অরাজকতা বিনাশ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

ইসলাম মানুষের কর্মকে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্ম এ দুভাগে বিভক্ত করে ইসলামী সংস্কৃতির সীমারেখাকে চিহ্নিত করেছে। ইসলাম যে সকল কর্মকে সৎ কর্ম বলে অভিহিত করেছে তা ইসলামী সংস্কৃতি আর যা কিছু অসৎ কর্ম বলে অভিহিত করেছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে অপসংস্কৃতি বলে গণ্য। এজন্যই ইসলাম খোদাবিমুখতা, ধর্মহীনতা, বস্তুবাদিতা, দুনিয়ামুখিতা, শরীয়তের বিধিবিধানের প্রতি নির্লিপ্ততা, স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদিতা, ক্ষমতা লিপ্সা, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধকে অস্বীকার, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, বিধিবিধান ও নিদর্শনসমূহের প্রতি অবমাননা, যে কোন নৈতিকতা ও মানবতা বিরোধী কর্মকে অপসংস্কৃতি বলে বর্জনীয় মনে করে।বর্তমানে মুসলমান সমাজ ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সাথেপরিচিত না হওয়া এবং তা থেকে দূরে থাকার কারণেই অমুসলমান ও পাশ্চাত্যের খোদাবিরোধী, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী মানবিক মূল্যবোধহীন সংস্কৃতিরকরালগ্রাসে আমরা পতিত হয়েছি। আর এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ মুসলমানদের বিশেষত মুসলিম যুবসমাজকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করানো এবং ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের ভিত্তিতে তাদের গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দান। ইসলামী সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবন দানের জন্য আমাদের ব্রত নিতে হবে। নতুবা আমাদের সমাজ অচিরেই অপসংস্কৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

নীতি-নৈতিকতা

আধ্যাত্মিক সফরের বাস্তব নির্দেশনা

নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

আধ্যাত্মিক সফরের বাস্তব নির্দেশনা

মোহাম্মদ আলী সোমালী

গত সংখ্যায় আমরা কতিপয় সাধারণ নীতি, যেমন শরীয়ত মেনে চলা এবং আমাদের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের যত্ন নেয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যাহোক, এমন কিছু অনুশীলনের বিষয় রয়েছে যা আমাদেরকে শক্তিশালী করতে পারে, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে বৃদ্ধি করতে পারে এবং যা আমাদেরকে সাহসী করতে পারে এবং আধ্যাত্মিক সফরের যাত্রা অব্যাহত **রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করতে পারে**। এগুলোই পরে আমাদেরকে সঠিক পথে রাখবে।

সকল মুসলিম অধ্যাত্মবাদী কর্তৃক পাঁচটি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যার মূল অবশ্যই কুরআন মজীদ ও সুন্নাহয় রয়েছে।

১. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া কথা না বলা

আমাদের উচিত অতিরিক্ত কথা না বলা। মানুষ মনে করতে পারে যে, এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কিন্তু বাস্তবে নিঃসন্দেহে এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের উচিত কেবল প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলা। দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ দ্বারা সংঘটিত পাপের অনেক ধরনই কেবল জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত। কতিপয় পণ্ডিত সত্তর প্রকারের পাপকে গণনা করেছেন। একদা এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে কিছু উপদেশ দেয়ার জন্য অনুরোধ করল।

قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْصِيْنِيْ فَقَالَ لَهُ احْفَظْ لِسَانَكَ–ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَوْصِيْنِيْ قَالَ احْفَظْ لِسَانَكَ– ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَوْصِيْنِيْ فَقَالَ وَيْحَكَ– وَ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ

মহানবী (সা.) বললেন : 'তোমার জিহ্বাকে (সংযত) রাখ।' পুনরায় সেই লোক উপদেশ দেয়ার জন্য অনুরোধ করল। মহানবী (সা.) বললেন : 'তোমরা জিহ্বাকে (সংযত) রাখ।' তৃতীয়বারের মতো লোকটি উপদেশ প্রার্থনা করল। মহানবী (সা.) বললেন : 'আহ! মানুষ তার জিহ্বার দ্বারা যা অর্জন করে তার চেয়ে আর কিছু কি আছে যার কারণে সে তার মুখমণ্ডলকে আগুনে নিক্ষেপ করে?'[১]

একটি কারণে কথা বলা অনেক গুনাহের কারণ হতে পারে, কারণ, আমরা সবসময় কথা বলি। আমরা অনবরত কথা বলি। কারণ, এটি আমাদের জন্য সহজ। এর জন্য আমাদের কোন চেষ্টা করতে হয় না, আর না আমাদের কোন উপাদান, মাধ্যম, প্রশিক্ষণ অথবা অর্থের প্রয়োজন হয়; আর এ কারণেই আমরা যা বলি তার ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ কম থাকে। বর্তমানকালে, একে অপরের সাথে কথা বলা আরো সহজ, যেহেতু যোগাযোগের নানা বিকল্প মাধ্যম এখন সহজলভ্য হয়েছে, যা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে যোগাযোগ করাকে হাতের নাগালে নিয়ে এসেছে, অতঃপর গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অনেক সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে লোকের তাদের মুখের মধ্যে পাথর রাখত যাতে কথা বলাটা তাদের জন্য কঠিন হয়। যদি তারা কিছু বলার চিন্তা করত তাহলে তাদেরকে প্রথমে মুখ থেকে পাথর বের করতে হতো। এ সময়ের মধ্যে তারা একাজের ব্যাপারে চিন্তা করত, তারা কথা বলার প্রয়োজনীয়তা এবং যা তারা বলতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে চিন্তা করত এবং অনুধাবন করত কথা না বলাটাই অপেক্ষাকৃত ভাল। এটি অপ্রয়োজনীয় কথা বলাকে কমিয়ে দিত। আমি এটি করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি না এবং আমি এটি কেবল এজন্য বর্ণনা করছি এই বিষয়ের প্রতি জোর দেয়ার জন্য যে, আমরা যা বলি তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন।

এমনকি যদি আমরা যা বলি তা নিষিদ্ধ (হারাম) নাও হয়, তবুও আমাদের উচিত হলো তা না বলা যদি না তা প্রয়োজনীয় হয়। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা আমাদের আধ্যাত্মিকতার জন্য ক্ষতিকর। আমাদের কথাগুলো কেবল আমাদের মন-মস্তিষ্ককে দখল করে রাখে, তাই নয়; বরং আমাদের হৃদয়ের ওপরও এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। এটি তেমনই যখন একজন মানুষ অধিক পরিমাণে বিষাক্ত খাবার খেয়ে ফেলে। এতে কেবল তার পাকস্থলিতেই ব্যথা হয় না; বরং সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অসুস্থতা অনুভব করে। আমাদের হৃদয় অপ্রয়োজনীয় কথা বলার দ্বারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন কোন কাজ বা কথা নেই যার আলো অথবা অন্ধকার ডেকে না আনে। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা বা বক্তব্য ক্ষতিকর এবং আমাদের হৃদয়কে অন্ধকার করে দেয়।২ আমাদের এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে নেয়া উচিত যেন এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্যতম। যদি আমরা কোন কথাকে দশটি বাক্যের পরিবর্তে পাঁচটি বাক্যে বলতে পারি, তাহলে আমাদের তাই করা উচিত। যদি আমরা কোন কিছু বলতে উদ্যত হই এবং পরক্ষণেই অনুধাবন করি যে, তা বলার প্রয়োজন নেই, তাহলে তা না বলাই উচিত।

মানুষ বলতে পারে যে, তাদেরকে পিতা-মাতা, পরিবার অথবা বন্ধুবান্ধবদের সাথে বসতে হয় এবং তাদেরকে অবশ্যই সামাজিক হতে হবে। এরূপ অবস্থায় আমাদেরকে অবশ্যই কিছু বলা উচিত, কিন্তু আমাদের সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আল্লাহর খাতিরে আমরা কি বলি। আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলতে পারি যে, আমরা আমাদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের খুশী করার জন্য কথা বলছি। 'একজন মুমিনের হৃদয়ে খুশী বয়ে আনা' ইবাদতের একটি কাজ। যাহোক, যে অন্যদের খুশী করার জন্য কিছু বলে এবং যে ব্যক্তি অন্যদের বিদ্রূপ করার জন্য কিছু বলে অথবা নিজের আনন্দের জন্য কিছু বলে অথবা অতিরিক্ত কথা বলার মাধ্যমে নিজেকে জাহির করতে চায় এই দুই ব্যক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

তাই আমাদের কথার দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মহানবী (সা.) একটি চমৎকার হাদীস রয়েছে যেখানে তিনি তাঁর কতিপয় সাহাবীকে বলেছিলেন :

لَوْ لَا تَكْثِيْرُ فِيْ كَلَامِكُمْ وَ تَمْرِيْجُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ لَرَأَيْتُمْ مَ أَرَى وَ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ

'যদি অতিরিক্ত কথা বলা এবং তোমাদের হৃদয় খারাপ চিন্তাভাবনা না আসত, তাহলে তোমরা আমি যা দেখি তা দেখতে পেতে এবং আমি যা শুনি তা তোমরা শুনতে পেতে।'

এটা থেকে বোঝা যায় যে, যদি আমরা অতিরিক্ত কথা বলি অথবা যা প্রয়োজনীয় নয় তা নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমরা উন্নতি করতে পারব না। কথা বলা ও না বলা খুব সহজ অথবা কঠিন হতে পারে। এটা সহজ হতে পারে কারণ, এখানে শেখার কিছু নেই, সেখানে কিনতে হবে এমন কিছু নেই এবং কোন বিশেষ স্থান নেই যেখানে এই উপদেশ প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের কিছুই করার প্রয়োজন নেই। আমাদেরকে

কেবল বলা হয়েছে অতিরিক্ত করা না বলতে। সুতরাং মনে হয় যে, এটি কঠিন নয়। কিন্তু আমরা যদি চেষ্টা করি, আমরা দেখতে পাব যে, এটি আসলেই খুব কঠিন। কখনো কখনো আমরা অনুভব করি যে, আমরা বুঝি ফেটে যাচ্ছি, কারণ আমরা ভীষণভাবে কোন কিছু বলতে চাচ্ছি। কিন্তু আমর যদি চর্চা করি, তাহলে এটি সহজতর হয়ে যাবে।

কিছু সংখ্যক হাদীস অনুযায়ী, নীরবতা হলো ইবাদতের একটি উত্তম পদ্ধতি। যেমন : ইমাম আলী (আ.) বলেন :

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الصَّبْرُ وَ الصَّمْتُ وَ انْتِظَارُ الْفَرَجِ

ধৈর্য, নীরবতা এবং ফরয পালনের জন্য অপেক্ষা করা ইবাদতের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ধরন।'[৪]

لَا عِبَدُهُ كَالصّمْتِ

'নীরবতার মতো কোন ইবাদত নেই।'[৫]

الصّمْتُ رَوْضَةُ الْفِكْرِ

'নীরবতা হলো চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বাগান।'[৬]

এটি এ কারণে যে, যখন কেউ নীরব থাকে তখন তার অন্তর আধ্যাত্মিক জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে শুরু করে। কিন্তু যদি কেউ কথা বলে তাহলে তার অন্তর পার্থিব জগৎ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার না খাওয়া

নীরব থাকার মতো একইভাবে কম খাওয়া আধ্যাত্মিকতাকে শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করে, যেন তা চেতনাকে বৃদ্ধি করতে অনুমোদন করে। অন্যদিকে আমরা যখন অতিরিক্ত খাবার খাই, যদিও আমাদের খাবার হালাল হয়, তবু তা আমাদেরকে ব্যস্ত রাখে এবং আমাদের চেতনাকে অলস করে। আমরা সতর্ক থাকতে পারব না। অন্যভাবে বলা যায়, আমরা যা খাই তা আমাদের শরীরের জন্য খাদ্য, কিন্তু উপোস

থাকা আমাদের আত্মার জন্য খাদ্য। যাহোক এখানে একটি উভয় সংকট রয়েছে, কারণ, আমাদেরকে আমাদের দেহ ও আত্মা উভয়কে খাদ্য দিতে হবে, যেহেতু দুটিরই খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে এবং আমাদেরকে অবশ্যই তাদের যথাযথ অধিকার দিতে হবে। তাহলে আমাদের কী করা উচিত? আমাদের উচিত আমাদের দেহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু খাবার খাওয়া এবং এভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে, আমরা আমাদের দেহ ও আত্মা উভয়ের ওপর ন্যায় বিচার করেছি। অতিরিক্ত খাওয়া আমাদের দেহ ও আত্মা উভয়ের ক্ষতি করে। উপোস থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী, যদি তা আমরা করতে পারি, কিন্তু যদি আমরা উপোস নাও থাকি, তবুও কেবল আমরা যতটুকু খাদ্য খাই তার থেকে কম খাওয়ার মাধ্যমে আমরা অনেক বড় অর্জন করতে পারি। এর একটি বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি আল্লামা তাবতাবাঈ আমাদেরকে দেখিয়েছেন। কখনো কখনো আমরা খাবার সময় এতটা ব্যস্ত থাকি যে, আমরা কী পরিমাণ খেয়েছি তা ভুলে যাই। মরহুম আল্লামা প্রতিবার খাবার সময় তিনি যতটুকু খেতে চান ততটুকু তাঁর খাবারের পাত্রে নিতেন এবং এরপর অন্য কিছু তিনি স্পর্শ করতেন না।

উপোস থাকা অথবা অল্প খাওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন : আল-উনওয়ান আল-বাসরীর প্রতি উপদেশে ইমাম সাদেক (আ.) বলেন :

أَمَّا اللَّوَاتِي فِي الرِّيَاضَةِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِيْهِ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْحَمَاقَةَ وَ الْبَلَهَ وَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوْعِ وَ إِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا وَ سَمِّ اللهَ وَ اذْكُرْ حَدِيْثَ الرَّسُوْلِ ص مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ فَإِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَ ثُلُثٌ لِشَرَابِهِ و ثُلُثٌ لِنَفْسِهِ

'আত্মশৃঙ্খলার তিনটি উপদেশ হলো : প্রথমত সেটা খেও না যেটার প্রতি তোমার কোন আকর্ষণ নেই, কারণ, এটি স্থূলবুদ্ধিপূর্ণ ও মূর্খতা বয়ে আনে, দ্বিতীয়ত যতক্ষণ তুমি ক্ষুধার্ত না হও ততক্ষণ খেও না; এবং তৃতীয়ত যখন তুমি খাবে তখন কেবল হালাল জিনিস খাবে এবং আল্লাহর নামে শুরু করবে আর মহানবী (সা.)-এর হাদীস স্মরণে রাখবে : মানুষ কখনোই তার নিজ পাকস্থলীর চেয়ে নিকৃষ্ট কোন কোন পাত্র পূর্ণ করেনি। সুতরাং যদি তুমি পূর্ণ কর, তাহলে এর এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, অপর এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং শেষ এক তৃতীয়াংশ বাতাসের জন্য রাখ।'

৩. অতিরিক্ত না ঘুমানো

এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমরা আমাদের সময় অপচয় না করি এবং আমাদের রাতের নামাযের সুবর্ণ সুযোগ হারাই। অতিরিক্ত আরাম আমাদের আত্মার জন্য বিষময়। আমাদের পরিমিত খাদ্য ও বিশ্রামের প্রয়োজন যাতে আমরা স্বাস্থ্যবান থাকি কারণ, নিজেদেরকে সেবা দিতে গেলে আমাদের সুস্বাস্থ্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমাদের দেহ ও আত্মার জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ আমাদের শরীরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, যখন আমরা আমাদের দেহের যত্ন নিই তখন আমরা আমাদের আত্মারও যত্ন নেই। একজন ধার্মিক ব্যক্তি হওয়ার জন্য আমাদের দেহকে ধ্বংস করার প্রয়োজন নেই। যদি আমরা অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করি তাহলে আমরা আমাদের শরীর ও আত্মাকে ধ্বংস করি। যদি আমরা অতিরিক্ত ঘুমাই, ব্যায়াম না করি এবং অলস জীবন যাপন করি তাহলে আমরা আমাদের শরীর ও আত্মাকে ধ্বংস করে ফেলব। তাই অতিরিক্ত না ঘুমানো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহিমান্বিত কোরআনে আল্লাহ মুমিনদের প্রশংসা করেছেন এভাবে :

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

'নিশ্চয় সাবধানীরা উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে থাকবে, তাদের প্রতিপালক যা তাদের প্রদান করবেন তা তারা সানন্দে গ্রহণ করবে; কারণ, তারা ইতঃপূর্বে (পার্থিব জীবনে) পুণ্যকর্মশীল ছিল, তারা রাত্রিতে অতি অল্পই শয়ন করত, তারা রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধন-সম্পদে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য অধিকার ছিল।' সূরা আয-যারিয়াত : ১৫-১৯

অনেক মানুষ আছে যারা বেশি ঘুমায় না কিন্তু সমস্যা হলো তারা জানে না যে, ঘুমানোর সঠিক সময় কোনটি। তাই তারা দিনের ঐ সময়ে ঘুমায় যখন ইবাদতের জন্য শ্রেষ্ঠ সময় এবং তারা এমন সময় জেগে থাকে যেটা সবচেয়ে কম উপকারী। উদাহরণস্বরূপ, কখনো আমরা অনেক রাতে ঘুমাই, মধ্যরাতের পর যখন ২টা বা ৩টা বাজে এবং তারপর ইবাদত ও ধ্যানের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়ে অচেতন

থাকি। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো ঊষার আগে সূর্যোদয় পর্যন্ত। কেউ যদি কিছু অর্জন করে থাকেন তবে এ কারণেই যে, তাঁরা এ সময়টিকে কাজে লাগিয়েছেন। আল্লামা তাবাতাবায়ী বলেন, নাজাফে গমনের প্রথম দিনগুলোতে তাঁর শিক্ষক মরহুম আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী কাযী তাঁকে বলেছিলেন : 'যদি তুমি দুনিয়া চাও, তাহলে তাহাজ্জুদ নামায পড়, যদি তুমি আখেরাত চাও তাহলেও তাহাজ্জুদ নামায পড়।'

৪. ধ্যানের জন্য একান্ত সময় রাখা

দিনে অথবা সম্ভবত রাতে আমাদের নিজেদের জন্য কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। নিজে নিজে এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, প্রতিদিন কমপক্ষে দশ থেকে পনের মিনিট আমরা একাকী বসব, উদাহরণস্বরূপ, নামাযের পাটিতে অথবা বাগানে, এবং চিন্তা করব। এটি শুরু করলেই হয়। কালক্রমে আপনি এই একান্ত সময়টাকে স্বাগত জানাবেন, হয়তো আপনি ইচ্ছা করবেন যে, এভাবেই আপনি সারাটি দিন অতিবাহিত করবেন। এটি আপনার জীবনে স্থিরতা আনবে যাতে এই সময়টির বিনিয়োগ আপনার অন্তরে একটি ব্যক্তিগত স্থান তৈরি করে নেয়। এইভাবে আপনি সমাজে সক্রিয় হতে পারবেন এবং একই সাথে আপনি আত্মিক শান্তি লাভ করবেন এবং আপনার কাজের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে যেন আপনি একাই ছিলেন। এটি হতে পারে যদি আপনি কিছুটা সময় নিঃসঙ্গ কাটাতে পারেন। যখন আপনি আপনার আত্মার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবেন, তখন আপনি সামাজিক, কর্মঠ ইত্যাদি হতে পারবেন এবং তারপরও আপনার কাজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখুন এবং আল্লাহকে স্মরণে রাখুন।

কিন্তু এই একান্ত সময়ে আমাদের কী চিন্তা করা উচিত?

আমাদের চিন্তা করা উচিত ঐশী বৈশিষ্ট্য ও কর্ম সম্পর্কে। আমরা যা করেছি সেসব নিয়ে, যেসব কাজ আমাদের করা উচিত ছিল কিন্তু আমরা করি নি এবং আমাদের আত্মা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, আমরা কোন উন্নতি করছি কিনা। যদি আমরা সঠিক কিছু করে থাকি তবে আমাদের উচিত সেজন্য আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানানো। যদি আমরা ভুল কিছু করে থাকি তবে

আমাদের সেটা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। যদি এতে আমরা দৃঢ়তা দেখাতে না পারি তবে আমাদের নিজেদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

অনেক সময় লোকজন জিজ্ঞাসা করে যে, যখন তারা জানে যে কিছু একটা সমস্যা রয়েছে এবং সে সেটা করতে চায় না কিন্তু তারা এটা কোন না কোনভাবে বার বার করে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ বলে যে, তাদের রাগের ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তারা জানতে চায় যে, এ সম্পর্কে তাদের কী করা উচিত। তারা বলে যে, তারা কোন মানসিক কারণে রাগান্বিত যে সম্পর্কে তারা কিছু করতে পারে না এবং এটা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যা হোক, আমাদের বোঝা উচিত যে, আল্লাহ আমাদের সকলকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু সমস্যা হলো আমরা হয়তো আমাদের এই ক্ষমতার অনুশীলন করি না। এ সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প রয়েছে।

একদা এক ব্যক্তি একটি অফিসে নতুন যোগদান করেছিল। অফিসে যোগদানের একেবারে প্রথম দিনই সে তার নতুন সহকর্মীদের বলল যে, সে তাদের কাছে কিছু বিষয় সরাসরি ব্যাখ্যা করতে চায় যাতে ভবিষ্যতে তারা যেন হতাশ বা মর্মাহত না হয়। সে তাদের বলল যে, দুর্ভাগ্যবশত সে একজন রাগী ব্যক্তি এবং যখন সে রাগান্বিত হয়ে যায় তখন সে চিৎকার করতে পারে, তাদেরকে অপমান করতে পারে অথবা তাদেরকে খারাপ কথা বলতে পারে কিন্তু তারা যেন এতে মর্মাহত বা রাগান্বিত না হয়। সহকর্মীদের মধ্যে একজন চালাক ব্যক্তি এই কথা শুনছিল। সে নতুন সহকর্মীকে এই কথার জন্য ধন্যবাদ জানালো এবং তাকে বলল যে, এটা ভাল হয়েছে যে, সে এটা বলেছে। সে বলল যে, এখন যেহেতু নতুন সহকর্মী তাদের সাথে কাছে সততার পরিচয় দিয়েছে, সেহেতু সে নিজেও তার কাছে সৎ থাকবে। সে তাকে বলল যে, সে নিজেও একজন রাগী ব্যক্তি এবং যদি কেউ তাকে কোন মন্দ কথা বলে তাহলে সে হাতের নাগালে যা পায় তাই সেই ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে দেয় এবং সে এজন্য খুশি হয়েছে যে, নতুন কর্মী আগেই তার কথা বলে দিয়েছে। এর পর সেই নতুন কর্মী কখনই রাগান্বিত হয়নি, সে সবসময় সতর্ক থাকত এবং লক্ষ্য রাখত যে, সে কী বলছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে যদি আমরা সত্যসত্যই চেষ্টা করি।

কখনো কখনো আমরা ঘরে খুবই রাগান্বিত ও আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ি কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আমরা খুবই শান্ত। এমনকি যদি লোকজন আমাদেরকে খারাপ কিছু বলে, তাহলেও আমরা আমাদের রাগ ভিতরে রেখে দিই। সুতরাং নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিন্তু বাস্তবে আমরা তা করাকে পছন্দ করি না। আমাদের এ সম্পর্কে কী করা উচিত?

আমরা এক্ষেত্রে যা করতে পারি তা হলো এর জন্য একটি জরিমানা নির্ধারণ করা। যেমন, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, যদি আমরা রাগান্বিত হই তাহলে আমরা এমন কিছু করব যা আমাদের পক্ষে করা কঠিন। আর আমাদেরকে নিজেদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। আমরা প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, যদি আমরা রাগান্বিত হই এবং আমাদের সহধর্মিনী, আমাদের সন্তানদের অথবা আমাদের পিতামাতাদেরকে মন্দ কথা বলি তাহলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করব অথবা পরবর্তী দিনে রোযা রাখব অথবা দশ কিলোমিটার হাঁটব। এটা কষ্টকর হওয়া উচিত। এরপর আমরা লক্ষ্য করব যে, আমরা শক্তি পাব; কারণ, আমাদের অন্তর কিছু হিসাবনিকাশ কষবে যে, রাগান্বিত ও আক্রমণাত্মক হওয়া যদিও আমাদেরকে আনন্দ দেয়, কিন্তু এর মাধ্যমে নিজেদের ওপর আরোপিত জরিমানা প্রদানের কারণে ক্ষতিও হবে। তাই আমাদের অন্তর নিজেই আচরণ করবে। একে বলা হয় 'মুশারিতাহ'। মুশারিতাহ মানে হলো নিজেদের ওপর কিছু শর্ত আরোপ করা এবং তা ভঙ্গ করার কারণে কিছু জরিমানা নির্ধারণ করা। অন্যদিকে আমরা যদি কোন ভাল কাজ করি তাহলে নিজেদেরকে পুরস্কৃত করতে পারি। যেমন, যদি আমরা মিষ্টি খুব পছন্দ করি, তাহলে আমরা নিজেদের বলতে পারি যে, আমরা মিষ্টি খাব না যদি না রাতের নামাযের জন্য উঠতে পারি। যদি আমরা উঠি, তাহলে আমরা মিষ্টি খেতে পারব। অতঃপর আমরা দেখব যে, আমাদের অন্তর আমাদেরকে রাতের নামাযের জন্য উঠতে সাহায্য করবে; কারণ, এটি মিষ্টি চায়। তাই এটি একটি কৌশল যা আমাদের ইচ্ছাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে।

যখন আমাদের জন্য কিছু একান্ত সময় থাকে কেবল তখনই আমরা এ ধরনের বিষয় নিয়ে চিন্তা ও পরিকল্পনা করতে পারি। যদি আমরা সবসময় ব্যস্ত থাকি তবে এমন বিষয় চিন্তা করতে পারব না। কিন্তু যদি আমরা পনের অথবা বিশ মিনিট আমাদের সাথে নিভৃতে কাটাতে পারি তাহলে আমরা এসকল বিষয় অর্জন করতে পারব। এটা

জানা কঠিন যে, কেন মানুষ নির্ভতে থাকাকে ভয় পায়। আমরা অনেক সময় তা লক্ষ্য করতে পারি। আমরা নিজেদেরকে অনেক ভালোবাসি কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হলো একাকী ছেড়ে দেয়া। যদি আমাদেরকে একটি কক্ষে রাখা হয় এবং ২৪ ঘণ্টার জন্য নিভৃতে বন্দি করে রাখা হয়, এমনকি যদি আমাদেরকে বলা হয় যে, আমাদেরকে খাদ্য দেয়া হবে এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়া হবে কিন্তু আমাদেরকে একাকী থাকতে হবে, তাহলেও আমরা প্রশ্ন করব যে, কেন আমাদেরকে সীমাবদ্ধ, বন্দি ও অত্যাচার করা হচ্ছে। কিন্তু এতে কি সমস্যা রয়েছে? আমাদেরকে তো কোন বন্য পশু বা আসামীর সাথে বন্দি করে রাখা হয়নি। আমাদেরকে কেবল বলা হয়েছে নিজেদের সাথে একাকী থাকতে। কেন আমরা নিজেদের সাথে নিভৃতে থাকতে চাই না? এর পেছনে অবশ্যই কোন অসুস্থ কারণ রয়েছে। ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন আল সাজ্জাদ (আ.) বলেন :

لَوْ مَاتَ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ– لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ الْقُرْآنُ مَعِي

'যদি পূর্ব ও পশ্চিমের সকল মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং আমি কেবলই কোরআনের সাথে একাকী রয়ে যাই, তবু আমি একাকী বোধ করব না।'

কিন্তু অধিকাংশ মানুষই একাকী থাকতে এত ভয় পায় যে, তারা অনবরত নিজেদের ব্যস্ত রাখে। আর যদি পাশে কেউ না থাকে তাহলে তারা কিছু শব্দ করার জন্য টেলিভিশন অথবা এমপিথ্রি অথবা রেডিওর সুইচ অন করে দেয় যাতে তারা অনুভব করতে পারে যে, তারা একাকী নয়। কিন্তু এটি খুবই খারাপ। আমাদেরকে অবশ্যই কখনো কখনো নিভৃতে থাকার চেষ্টা করতে হবে; আমাদের কিছু ব্যক্তিগত সময় থাকবে, কিছুটা বিশ্রাম ও আরামের সময় থাকবে এবং এমন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. অবিরত আল্লাহকে স্মরণ রাখা

আল্লাহকে ভুলে যাওয়া সকল আধ্যাত্মিক সমস্যার উৎস এবং স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর স্মরণ হলো এর প্রতিকার। দোয়ায়ে কুমাইলে আমরা পড়ি :

হে প্রভু! আমি তোমার নৈকট্য কামনা করি তোমার স্মরণের মাধ্যমে

হে তিনি, যাঁর নাম ঔষধ এবং যাঁর স্মরণ আরোগ্য।

সুতরাং আল্লাহর স্মরণ অন্তরে প্রশান্তি এবং আলো নিয়ে আসে

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

'তারা সেসব লোক যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের চিত্ত আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।' সূরা রাদ : ২৮

ইমাম আলী বলেন :

'নিশ্চয়ই আল্লাহ, প্রশংসিত, তাঁর স্মরণকে, অন্তরসমূহের জন্য সজ্জা ও ঔজ্জ্বল্য করেছেন।'

সুতরাং এটি স্পষ্ট হয় যে, কেন আল্লাহকে স্মরণের ওপর এতটা জোর দেয়া হয়েছে। কুরআন বলে :

قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ كَثِيرٗا وَسَبِّحۡ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِبۡكَٰرِ ﴿٤١﴾

সে (যাকারিয়া) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য কোন নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিনদিন পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না, তবে ইঙ্গিতে এবং (এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) নিজ প্রতিপালককে অধিক স্মরণ কর। আর রাতে ও অতি প্রত্যুষে (আমার) মহিমা বর্ণনা কর।' সূরা আলে ইমরান : ৪১

وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا ﴿٨﴾

'সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি মগ্ন হও।' সূরা মুযযাম্মিল : ৮

وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعٗا وَخِيفَةٗ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

'এবং নিজ প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে ও শংকিতচিত্তে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর, আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' সূরা আরাফ : ২০৫

ইসলামে প্রতিটি বিষয়ের একটি সীমা রয়েছে, এমনকি রোজা ও হজের স্মরণ যা সর্বদা এবং সকল অবস্থায় ভালো এবং প্রয়োজনীয়।[১১]

আহমাদ ইবনে ফাহদ হিল্লি কুরআন থেকে ব্যাখ্যা করেন, তিনি বলেন :

'জেনে রাখ যে, আল্লাহর নিকট তোমার কর্মসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সবচেয়ে খাঁটি এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যে জিনিসের ওপর সুর্য আলো ফেলেছে তা হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্মরণ। নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে এটি বলেছেন : 'আমি তার সাথি যে আমাকে স্মরণ করে।'[১২]

প্রতিনিয়ত আল্লাহর স্মরণ কঠিন আবার কঠিন নয়। এটি কঠিন নয়, কারণ, এর জন্য আমাদের কোন মূল্য দিতে হয় না, এর জন্য আমাদের অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না, অথবা কোন বিশেষ জায়গায় যেতে হয় না অথবা কোন শারীরিক অনুশীলন করতে হয় না। তাই এটি খুব সহজেই হওয়া উচিত। যেহেতু উপরে উল্লিখিত সকল অনুশীলনের কোনটির জন্যই আমাদের কোন মূল্য দিতে হয় না এবং তাই এগুলো খুবই কার্যকর পদ্ধতি যখন আমরা এগুলো যা প্রোডিউস বা উৎপন্ন করতে পারে তা বিবেচনা করি। যাহোক এটি করা খুবই কঠিন। কারণ, আমাদের অন্তরসমূহ নিজেই প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। সেটা করতে চায় যা সে চায় এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ হতে চায় না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের অন্তরকে শৃঙ্খলাপূর্ণ করি তাহলে বিষয়টি সহজ হয়ে যায়।

আল্লাহর স্মরণ উপশম করে। আল্লাহর নাম ঔষধ এবং আমরা যদি এই ঔষধ গ্রহণ করি আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য তাহলে আমরা আরোগ্য লাভ করব, কিন্তু যদি আমরা অনবরত আল্লাহর নাম উচ্চারণ করি, যেমন 'আল্লাহু আকবার' বারবার পুনরাবৃত্তি করি তাহলে আমরা কেবল আমাদের মুখকে পুনরাবৃত্তির কাজে ব্যস্ত রাখছি এবং এটি আল্লাহর যথাযথ স্মরণ নয়।

যাহোক, যদি আমরা আল্লাহর নামকে তাঁকে স্মরণ করার জন্য ব্যবহার করি তাহলে তা উপশমকারী হবে। এটি করা খুব সহজ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা গাড়ি চালানো অথবা হাঁটা অবস্থায় থাকতে পারি অথবা যা আমাদের করা দরকার আমরা তা করতে

পারি এবং তারপরও আল্লাহকে স্মরণ করতে পারি। পবিত্র কুরআন এমন লোকদের কথা বলে যারা এমনকি আল্লাহকে ভোলে না যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে। তারা সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে। আমরা রান্না করতে পারি অথবা কাপড় ধুতে পারি, শিক্ষা দিতে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকতে পারি, কিন্তু একই সময়ে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করব। তাই আমাদের আল্লাহকে স্মরণ করা প্রয়োজন আর এমন নামোচ্চারণই আমাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করার মাধ্যম। বিভিন্ন ধরনের যিকির, যেমন আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ এবং সুবহানাল্লাহ) হলো ঔষধ, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই এই ঔষধগুলো সঠিকভাবে নিতে হবে আলআলাহর স্মরণের মাধ্যমে, আল্লাহর সেই সকল বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে যা উল্লেখ করা হচ্ছে এবং তারপরই আমরা অনুভব করব যে, আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী।

সুতরাং এভাবে আমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করা উচিত এবং 'যদি আমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহর স্মরণের সুমিষ্টতা ও সৌন্দর্যের স্বাদ আস্বাদন করি তাহলে আমরা কখনই অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হব না। আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরে সকল খারাপ বিষয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন এবং তখন আমরা প্রকৃতই আল্লাহর স্মরণকে উপভোগ করতে শুরু করব।

যদি আমরা কিছু সময় একান্তে অতিবাহিত করি তাহলে আমরা একান্তে আল্লাহর স্মরণ করতে শিখতে পারব এবং এরপর এটিকে আমাদের জীবনের বাকি সময়ে সম্প্রসারিত করব। শুরুতে আমরা আল্লাহকে কেবল নামাযের পাটিতে স্মরণ করতে পারি। কিন্তু ধীরে ধীরে সারাদিন ধরে আল্লাহকে স্মরণ করতে চেষ্টা করতে পারি। তারপর আল্লাহর স্মরণ মজ্জাগত ও স্থায়ী হয়ে যাবে।

আপনার জীবনে এসব আচরণ বাস্তবায়িত করার জন্য একটি পরামর্শ

ওপরে আমরা দেখেছি যে, পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের পালন করা প্রয়োজন : অতিরিক্ত কথা না বলা, অতিরিক্ত না খাওয়া, অতিরিক্ত না ঘুমানো, নামোচ্চারণের জন্য একান্ত সময় থাকা (মানুষের সাথে অতিরিক্ত না মেশা অথবা নিজেদের অতিরিক্ত ব্যস্ত রাখা) এবং আল্লাহকে প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখা। পাঁচটি খুবই সহজ বিষয় রয়েছে যার জন্য কোন ব্যয় করতে হয় না। সেগুলো আমাদের আধ্যাত্মিক

স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী ভিটামিন। যদি কোন ব্যক্তি কয়েক সপ্তাহ এগুলো করতে থাকে তাহলে সে নিশ্চয়ই পার্থক্য অনুধাবন করতে শুরু করবে এবং ফলাফল দেখবে।

একটি বাস্তব পদক্ষেপ হলো একটি নোটবুক রাখা এবং প্রতিদিনের জন্য নিজের ক্ষেত্রে কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা। প্রতিটি বিভাগের জন্য নম্বর দেয়া। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কিছু মন্তব্যও এর সাথে যুক্ত করা। তারপর একটি নিয়মিত ভিত্তিতে মন্তব্যকে পর্যালোচনা করুন এবং উন্নতির মূল্যায়ন করুন। এটি প্রতিদিন করুন এবং লক্ষ্যের সাথে আপনার কর্মের তুলনা করুন। যদি সকল কর্ম উত্তম হয়, তাহলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এবং এটি চালু রাখুন। যদি কোন ক্ষেত্রে মন্দ হয়ে থাকে তাহলে ভালো করার চেষ্টা করতে থাকুন ও উন্নতি করুন। প্রথম কয়েক সপ্তাহ কোন কারণে এই প্রক্রিয়াকে বিলম্ব করার সুযোগ নিবেন না। সকল পরিস্থিতিতে ছকটি পূরণ করুন। এটি আপনার জীবনে শৃঙ্খলা বয়ে আনবে। যদি আপনি অনুভব করেন যে, আপনি কিছু অর্জন করছেন তাহলে আপনি আরো দৃঢ়চিত্ততা অনুভব করবেন। যদি আপনি অনুধাবন করেন যে, কিছু ক্ষেত্রে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আপনি উন্নতি করতে পারছেন না তাহলে আপনি নিজে নিজেই এর জন্য একটি জরিমানার বা শাস্তির ব্যবস্থা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমি লক্ষ্য করি যে, আমি রাগান্বিত হওয়াকে বজায় রেখেছি, তাহলে আমি এমন একটি কাজ খুঁজে নেব যেটা আমার জন্য করাটা কঠিন, যেমন ঘরের কাজ। তারপর আমি এটাকে আমার জন্য একটি শাস্তি হিসাবে গ্রহণ করব। যেমন আমি বলতে পারি : 'আমি যদি রাগান্বিত হই, তাহলে দুই দিন আমি ঘরের সকল কাজ করব।' এই সময়ের মধ্যে আমি কয়েক বার এমন শাস্তি ভোগ করেছি, আমি রাগান্বিত হওয়ার আগে ভাবতে শিখব এবং নিজেকে দমন করব। একই ভাবে উত্তম কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আপনি নিজের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করতে পারেন। এভাবে আপনি আপনার দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে পারেন। মহান আল্লাহর সাহায্য সবসময় তাদের জন্য থাকে যারা তাঁর জন্য চেষ্টা করে থাকে :

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

'যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে আমরা তাদের অবশ্যই আমাদের পথসমূহের নির্দেশনা দান করব; এবং নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যকর্মশীলদের সাথি।' সূরা আনকাবুত : ৬৯

একই আসক্তিসম্পন্ন বন্ধু বেছে নেয়াটাও এ ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক, যে বন্ধুর সাথে আপনি আপনার অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এভাবে আপনারা একে অপরকে উপদেশ দিতে পারেন। কুরআন বলে :

إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

'নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত) আছে, তবে তারা ব্যতিরেকে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।' সূরা আস্‌র : ২-৩

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে আমরা বিভিন্ন বাস্তব কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করেছি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মগঠন করতে পারি। অল্প কথা বলা, স্বল্প আহার, অল্প ঘুম, নিজের জন্য একান্ত সময় রাখা এবং আল্লাহকে স্মরণের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে শুরু করতে পারব। উপরে যেসব কৌশল আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো .. নয় আবার দামিও নয়; বরং এগুলোর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও দৃঢ়তা। আমরা দোয়া করি যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আমাদেরকে এগুলো অর্জনের তৌফিক দিন যাতে আমরা সত্যিকার পুরস্কার অর্জন করি; আর তা হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সাহায্য করুন।

অনুবাদ : মো. আশিফুর রহমান

১. বিহারুল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড, পৃ. ১৬১

২. কিছুসংখ্যক মানুষ হয়তো আশ্চর্যান্বিত হতে পারে যে, কেন তারা তাদের হৃদয়ের অন্ধত্ব বুঝতে পারে না যখন তারা অধিক কথা বলে অথবা এমনিক যখন তারা পাপপূর্ণ কথা বলে, যেমন গীবত করা। এর উত্তর হলো এই যে, মানুষের অনুভূতি খুবই বৈচিত্র্যময়। মাওলানা রূমীর 'মসনভী' তে একটি গল্প রয়েছে যা এই বাস্তবতাকে তুলে ধরে। রূমী বলেন, এক ব্যক্তি তার ঘোড়াকে সুগন্ধির বাজারে নিয়ে গেল। সেই ঘোড়া বাজারটিকে ময়লালিপ্ত করে ফেলল। এই ব্যাপারটি

সুগন্ধি বিক্রেতাদেরকে মর্মাহত করল, যেহেতু এর আগে বাজারটির প্রতিটি কোনা সুগন্ধিতে ভরে ছিল। তারা সেই বাজারটিকে পরিষ্কার করতে চাইল, কিন্তু সেই দুর্গন্ধের স্থানে যাওয়ার কারো সাধ্য ছিল না। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে এমন কোন ব্যক্তিকে ভাড়া করবে যে এসব দুর্গন্ধের ব্যাপারে অভ্যস্ত। তাই তারা একজন যুবককে খুঁজে বের করল যার কাজ ছিল ঘোড়াকে গোসল করানো ও পরিষ্কার করা। তারা তাকে বাজারে নিয়ে আসল, কিন্তু সুগন্ধি সেই যুবকের নাকে পৌঁছামাত্র সে অজ্ঞান হয়ে গেল যেহেতু সে সুগন্ধ সহ্য করতে পারল না। এটা এজন্য হয়েছিল যে, সুগন্ধি গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা তার পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে এমন মানুষ আছে যারা ময়লায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে– তা দৈহিক হোক বা আত্মিক। তারা কেবল ময়লায় অভ্যস্তই হয়নি; বরং তাদের পবিত্রতার প্রতি অ্যালার্জি রয়েছে। তাই যদি আমরা কোন কিছুকে খারাপ মনে না করি, অথবা আমরা যদি অনুভব না করি যে, আমাদের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, এর কারণ এটা নয় যে, ভাল জিনিসের কোন প্রভাব নেই; বরং আমাদের হৃদয় স্পর্শকাতরহীন হয়ে পড়েছে। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার সর্দি লেগেছে এবং খাদ্যের স্বাদ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। উপরন্তু কখনো কখনো উপাদেয় খাদ্য তার কাছে কটু বা তিতা মনে হয়; এটা এজন্য নয় যে, খাদ্যটি তিতা, বরং তার স্বাদের বিকৃতি ঘটেছে।

৩. আল-মীযান ফি তাফসীর আল-কুরআন গ্রন্থে উল্লিখিত সুন্নি সূত্র হতে বর্ণিত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫

৪. বিহারুল আনওয়ার, ৬৮তম খণ্ড, পৃ. ৯৭

৫. গুরারুল হিকাম ওয়া দুরারুল কালিম, হাদীস নং ১০৪৭৮১

৬. গুরারুল হিকাম ওয়া দুরারুল কালিম, হাদীস নং ৫৪৬

৭. বিহারুল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬

৮. প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রামের কর্মকে একটি উত্তম অভিপ্রায় দ্বারা ইবাদতে পরিণত করতে পারি। যেমন, আমি আল্লাহর সেবা করার জন্য শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে খাদ্য গ্রহণ করতে পারি; আর এতে আমার খাদ্য গ্রহণ অথবা

৯. বিহারুল আনওয়ার, ৪৬তম খণ্ড, পৃ. ৫৪

১০. নাহজুল বালাগা, খুতবা ২১৯

১১. উদাহরণস্বরূপ, দ্রষ্টব্য আল-কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৮ ও ৪৯৯

১২. উদ্দাত আল-দাঈ, পৃ. ২৩৮

(মেসেজ অব সাকালাইন, ভলিউম ১১, নং ১, স্প্রিং ১৪৩১/২০১০ থেকে অনূদিত)

নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৃত্যুকে স্মরণ করার ফযিলত

যখন মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে ও চিরস্থায়ী জীবনকে অবহেলা করতে থাকে তখন সে যে কোন ধরনের পাপ ও অন্যায় কাজে জড়িয়ে যায়– সে শয়তানের জালে বন্দি হয়ে পড়ে। তার এ অবাধ্য সত্তাকে বশ মানানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কষ্টের ভূমিকা পালন করতে পারে মৃত্যুর স্মরণ।

আলী (আ.) বলেছেন : 'তোমার নিজেকে মৃত্যুর স্মরণ দ্বারা পোষ মানাও।'

মানুষ যদি মনোযোগ দেয় তাহলে দেখতে পাবে শীঘ্র অথবা বিলম্বে মৃত্যু আসবেই, তার দেহকে কবরে রাখা হবে, তার অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুলো মাটিতে পরিণত হবে। যখন তাকে এগুলো মনে করিয়ে দেয়া হবে তখন সে পাপ কাজ থেকে তার সম্পর্কে ছেদ করবে। মৃত্যুকে স্মরণে রাখলে অহংকার ভেঙে যায় এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকা যায়। রাসূরে আকরাম (সা.) বলেন :

اكثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَمْحُو الذُّنُوْبَ

'বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ করো। কারণ, মৃত্যুর স্মরণ গুনাহগুলোকে ঝেড়ে ফেলে।'[১]

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেন :

اَلْمَوْتُ اَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ

'মৃত্যুর বন্ধন ছায়ার চেয়েও জোরালো।'[২]

রাসূল (সা.) মৃত্যুর স্মরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন :

اَفْضَلُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيا ذِكْرُ الْمَوْتِ و اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَ اَفْضَلُ التَفَكُّرِ ذِكْرُ الْمَوْتِ فَمَنْ اَثْقَلَهُ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَجَدَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

'পৃথিবীতে মৃত্যুর স্মরণ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধার্মিকতা, শেষ্ঠ ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ চিন্তা। যে মৃত্যু নিয়ে বেশি করে চিন্তা করে সে তার কবরকে জান্নাতের বাগানের মতো পাবে।'[৩]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন :

ذِكْرُ الْمَوْتِ يُمِيْتُ الشَّهْوَاتِ فِي النَّفْسِ وَ يَقْطَعُ مَنَابِتَ الغَفْلَةِ وَ يُقَوِّيَ الْقَلْبَ بِمَوَاعِدِ اللهِ وَ يُرِقُّ الْطَبْعَ وَ يَكْسِرُ اَعْلاَمَ الْهَوَى وَ يُطْفِئُ نَارَ الْحِرْصِ وَ يُحَقِّرُ الدُّنْيَا

'মৃত্যুর স্মরণ মানুষের কামনা-বাসনাকে হত্যা করে, অজ্ঞতার ঝর্নাকে শুকিয়ে ফেলে এবং আল্লাহর প্রতিজ্ঞার ওপর নির্ভর করার জন্য হৃদয়কে শক্তিশালী করে, বদমেজাজকে নমনীয় করে, ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পতাকা ভেঙে ফেলে, লোভের আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং পৃথিবীকে কষ্টের এবং মূল্যহীন বলে চিত্রিত করে।'[৪]

আলী (আ.) বলেন :

اَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ يَوْمَ خُرُوْجِكُمْ مَنَ الْقُبُوْرِ وَ قِيَامَكُمْ بَيْنَ يَدَي اللهِ

'তোমার মৃত্যুকে স্মরণ কর এবং ঐ দিনকে স্মরণ কর যখন তুমি পুনরুত্থিত হবে কবর থেকে এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। এ স্মরণ তোমার বিপর্যয়কে দূর করবে।'[৫]

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হচ্ছিল। রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন : 'সে কি মৃত্যুকে স্মরণ করে?' উপস্থিত সকলে জবাব দিল : 'সে মৃত্যু সম্পর্কে কোন কথা বলেছে বলে আমরা স্মরণ করতে পারছি না।' রাসূল বললেন : 'সে প্রশংসা পাবার যোগ্য নয়।'[৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : 'সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কে?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন : 'তারাই যাদের মৃত্যুর স্মরণ খুব বেশি এবং এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রস্তুত।'[৭]

রাসূল (সা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : 'যে অন্যের মৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, তার দুর্দশা কবরের দীর্ঘজীবন এবং কিয়ামতের দিনে তার হতবুদ্ধি হওয়ার বিষয় স্মরণ করে না, সে বিফলকাম। এ পৃথিবীতে যে মৃত্যুকে পরোয়া করেনি সে এ

জগতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে এবং যার এ পৃথিবীতে মৃত্যুর স্মরণ বেশি সেই সফলকাম।'[৮]

দুটি দল

মৃত্যুর বিষয়কে কেন্দ্র করে দুধরনের মানুষ আছে : প্রথম দল মৃত্যুকে একেবারেই স্মরণ করে না এবং এরা পরকালে বিশ্বাসী নয়; এ জগতে তাদের আচরণ হয় অশালীন। তারা মনে করে মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের যা কিছু আছে তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। ইমাম হুসাইন (আ.)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন আমরা মৃত্যুকে ভয় করি এবং এতে আগ্রহী হই না? ইমাম জবাব দিয়েছিলেন : 'কারণ, তুমি তোমার পরকালকে ধ্বংস করেছ, কিন্তু পৃথিবীর জীবনকে গঠন করেছ। আর তাই তুমি সমৃদ্ধির অবস্থা হতে ধ্বংসাত্মক অবস্থায় যেতে ভয় পাও।' রেফারেন্স

দ্বিতীয় দলটি হলো যারা মৃত্যুকে ভয় পায় না। তারা পরকালকে বিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। তারা বিশ্বাস করে এ দেহের খাঁচা ভেঙে ফেলার মাধ্যমে তারা পরকালের আনন্দ উপভোগ করবে। তারা শুধু মৃত্যুকে ভয় পায় না, তা নয় বরং একে মধুর চেয়েও মিষ্টি বলে মনে করে।[৯]

হযরত আলী (আ.) মানুষকে যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করে বলতেন : 'যদি তোমরা যুদ্ধে নিহত না হও, তবু মরবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর কবজায় আমার প্রাণ, হাজার তরবারির আঘাত আমার কাছে শয্যায় মৃত্যুবরণ করার তুলনায় সহজ।'[১০]

আলী (আ.) বলেন :

اَفْضَلُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ

'একজন মুমিনের শ্রেষ্ঠ উপহার হলো মৃত্যু।'[১১]

কেননা, দুনিয়া ঈমানদার ব্যক্তির জন্য জেলখানা (الدنيا سجن المؤمن)। সে সর্বদা দুঃখ-কষ্ট এবং নাফ্স ও শয়তানের তরফ থেকে বিপদে পতিত থাকে। মৃত্যুর ফলস্বরূপ সে এ আযাব থেকে নিষ্কৃতি পায়। এ নিষ্কৃতি তার জন্য উপঢৌকন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে :

اَلْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

'মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের কাফফারা।'[১২]

এখানে সত্যিকার ঈমানদারদের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে ঈমানদারের চরিত্র বিদ্যমান এবং সে সগীরা গুনাহ ও ছোটখাটো বিচ্যুতি ছাড়া কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় না। সে যদি ফরয কাজ সম্পাদন করে তাহলে ছোট ছোট গুনাহর জন্য মৃত্যু কাফফারা হয়ে যায়।

মৃত্যুর আলিঙ্গনকে পছন্দ করা

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন :

فِي الْمَوْتِ نَجَاةُ الْمُخْلِصِيْنَ وَ هَلَاكُ الْمُجْرِمِيْنَ وَ لِذَالِكَ اشْتَاقَ مَنِ اشْتَاقَ اِلَى الْمَوْتِ وَ كَرِهَ مَنْ كَرِهَ قَالَ النَّبِيُّ (ص): مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ

'মৃত্যুতে নিহিত আছে বিশ্বাসীদের জন্য মুক্তি এবং পাপীদের জন্য ধ্বংস। এজন্যই কিছু সংখ্যক মৃত্যুকে ভালোবাসে আর অন্যরা ঘৃণা করে। মহানবী (সা.) বলেছেন : যে আল্লাহর সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং যে আল্লাহর সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করে, আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন।'[১৩]

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে আমরা মৃত্যুর এ আকাঙ্ক্ষা দেখতে পাই। ওহুদের যুদ্ধের পর হযরত আলী (আ.) মনে কষ্ট নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলেন : হে রাসূলুল্লাহ! আমি আজও শহীদ হতে পারলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন : হে আলী! নিশ্চয়ই তুমি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। এরপর থেকে আলী (আ.) অপেক্ষা করতে থাকেন, কবে তিনি শহীদ হবেন। তিনি প্রায়ই তাঁর দাড়িতে হাত বুলাতেন আর বলতেন : 'আমি ভুল শুনিনি; আর আমাকে মিথ্যা বলা হয়নি। নিশ্চয়ই এ দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হবে।'

যখন ১৯ রমযান হযরত আলী (আ.) অভিশপ্ত মুলজিম মুরাদী কর্তৃক আহত হলেন তখন তিনি বলে উঠলেন :

فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَة

'কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি।

ইয়াযীদ যখন ইমাম হুসাইন (আ.)-কে আনুগত্য করার আদেশ দিয়ে চিঠি প্রেরণ করে তখন তিনি বলেন :

اني لا ارى الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمين الا برما.

'অবশ্যই আমি মৃত্যুকে সৌভাগ্য এবং যালেমদের সাথে বেঁচে থাকাকে দুর্ভাগ্য ব্যতীত অন্য কিছু মনে করি না।'[১৪]

তিনি আরও বলেন :

موت في عز خير من حياة في ذل.

'লাঞ্ছনার জীবনের চেয়ে সম্মান সহকারে মৃত্যুই শ্রেয়।'[১৫]

ইমাম হুসাইন কারবালায় যাওয়ার পথে যি হিসাম্ নামক স্থানে এ কথা বলেন।

الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن في لقاي ربه محقا.

'তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, সত্যের ভিত্তিতে কাজ করা হয় না এবং বাতিল থেকে বিরত থাকা হচ্ছে না? অতএব, (এহেন পরিস্থিতিতে) যথার্থভাবেই মু'মিনের উচিত তার রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী হওয়া।'[১৬]

ইমাম হুসাইনের সঙ্গী-সাথিদের মধ্যেও একই চেতনা দেখতে পাই।

আমাদের দায়িত্ব

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বললেন : পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর : যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে; সুস্থতাকে রুগ্নতার পূর্বে; প্রাচুর্যকে দারিদ্র্যের পূর্বে; অবসর মুহূর্তকে কর্মব্যস্ততার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।'[১৭]

তিনি আরো বলেন : 'দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ লোকসানে পতিত– একটি সুস্থতা এবং অপরটি অবসর।'[১৮]

অর্থাৎ মানুষ এ দুটি নেয়ামতকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে না। কিন্তু যখন এগুলো হাতছাড়া হয়ে যায় তখন এর কদর বোঝে।

আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন কেবলই পার্থিব বিষয়াদির জন্য নিয়োজিত না করি সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আজ যে বিষয়ের জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি হতে পারে এ বিষয়গুলোর কোন প্রয়োজন নেই, অথচ এক দিন এর জন্যই আমাদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। হযরত আলী (আ.) আমাদের সেই বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন :

'হে আল্লাহর বান্দাগণ! জেনে রাখ, তোমরা এবং এ দুনিয়াতে তোমাদের যা কিছু আছে সবকিছু সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে যে দিকে তোমাদের পূর্ববর্তীরা চলে গেছে। তারা দীর্ঘায়ু পেয়েছিল, তাদের ঘর জনাকীর্ণ ছিল এবং তাদের চিহ্ন বেশি স্থায়ী ছিল। তাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে, তাদের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের দেহ পচে গেছে, তাদের ঘর শূন্য হয়ে গেছে এবং তাদের চিহ্নও মুছে গেছে। তাদের জাঁকজমকপূর্ণ স্থান ও বিস্তৃত গালিচা পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। তারা এখন সংকীর্ণ গর্ত আকারের কবরে শুয়ে আছে যার ভিত্তি ধ্বংসের ওপর এবং এর নির্মাণ মাটি দ্বারা করা হয়েছে। এ নির্মাণ এত সংকীর্ণ যে, এর ছাদ তাদেরকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলে এবং যারা এতে স্থায়ী বাসা বেধেছে তারা যেন দূরে সরিয়ে দেয়া অপরিচিত ব্যক্তি।... তারা যেখানে গেছে তোমাদেরকেও সেখানে যেতে হবে। যে নিদ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করেছে সে নিদ্রা তোমাদেরকেও ধরবে। যতটুকু স্থান তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে ততটুকু তোমাদের জন্যও নির্ধারিত। তখন তোমাদের অবস্থা কী হবে যখন তোমাদের আমলসমূহ তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছবে এবং কবরসমূহ ওলট-পালট হয়ে যাবে?'...[১৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সাহাবীদের মধ্যে কোন উদাসীনতা দেখতে পেতেন অথবা ভ্রান্তি লক্ষ্য করতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন : 'তোমাদের কাছে মৃত্যু এসেছে অপরিহার্য হয়ে– দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য নিয়ে।'[২০]

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন কার আমল সুন্দর, তা দেখার জন্য।'[২১]

সুদ্দী (রহ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : 'উদ্দেশ্য এই যে, কে মৃত্যুকে বেশি করে তার প্রস্তুতি ভালোভাবে নেয় এবং তাকে বেশি ভয় করে।'

হযরত লোকমান নিজের পুত্রকে বলেন : 'বৎস! মৃত্যু কখন আসবে তা তোমার জানা নেই। সুতরাং আকস্মাৎ মৃত্যু আসার পূর্বে তুমি প্রস্তুতি নিয়ে নাও। আশ্চর্যের বিষয় মানুষ আনন্দ-কোলাহলে মত্ত থাকা অবস্থায় যদি কল্পনা করে এখনি এক সিপাহী এসে লাঠির ওপর লাঠি মারতে থাকবে, তবে তার সমস্ত আনন্দ বিষাদ হয়ে যাবে। মানুষ জানে, মালাকুল মাওত অকস্মাৎ মৃত্যুর যন্ত্রণা নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু এতে তার আরাম-আয়েশ এতটুকু মলিন হয় না। এর কারণ মূর্খতা ও বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।'[২২]

হযরত আলী (আ.) আমাদের করণীয় সম্বন্ধে তাঁর এক খুতবায় বলছেন : 'হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মৃত্যুর আগেই সৎ আমলে নিজেকে নিয়োজিত কর। পার্থিব সম্পদ তথা দুনিয়ার ভোগবিলাসের বিনিময়ে অনন্তকালীন আনন্দ ক্রয় কর। অনন্ত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। কারণ, তোমরা সেদিকে তাড়িত হচ্ছ এবং মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর, কারণ, মৃত্যু তোমাদের মাথার ওপর ঘুরছে। এমন লোক হও যারা আহ্বান মাত্রই জেগে ওঠে, যারা জানে এ দুনিয়া তাদের আবাসস্থল নয় এবং যারা এ দুনিয়াকে পরকালের সঙ্গে বদল করে নিয়েছে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি এবং অকেজোভাবে তোমাদেরকে ফেলেও রাখেননি। তোমাদের এবং বেহেশত অথবা দোযখের মধ্যবর্তী মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই যা তোমাদের ওপর আপতিত হবেই। প্রতিটি মুহূর্ত জীবন থেকে খসে গিয়ে জীবনকে খর্ব করছে এবং প্রতিটি মুহূর্ত এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে খাটো হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করতে হবে। মৃত্যু নামক গুপ্ত ঘটনা দিবারাত্র তোমাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। মৃত্যুপথের অভিযাত্রীকে সর্বোত্তম রসদ সংগ্রহ করতে হবে। সুতরাং এ দুনিয়াতে থাকাকালেই এমন রসদ সংগ্রহ কর যা দিয়ে আগামীকাল নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

সুতরাং প্রত্যেকের উচিত আল্লাহকে ভয় করা, নিজেকে সতর্ক করা, তওবা করা, কামনা-বাসনাকে প্রতিহত করা; কারণ, মৃত্যু তোমাদের কাছে গুপ্ত, কামনা-বাসনা তোমাদেরকে প্রতারিত করে এবং শয়তান তোমাদের পিছে লেগে আছে। শয়তান পাপকে মনোমুগ্ধকর করে উপস্থাপন করে এবং তওবা করতে বিলম্ব ঘটানোর জন্য এমন বেখবর বানিয়ে দেয় যে, অসতর্ক অবস্থায় তওবার পূর্বেই মৃত্যু এসে পড়ে।...[২৩]

মৃত্যু সম্পর্কে একটি ঘটনা

আমাশ খায়ছাড়া (রহ) বর্ণনা করেন- মালাকুল মাওত হযরত সোলায়মান (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর জনৈক সভাসদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। বাইরে চলে আসার পর সভাসদ হযরত সোলায়মান (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করল : লোকটি কে? তিনি বললেন : সে মালাকুল মাওত। সভাসদ বলল : 'সে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে আমার প্রাণ কেড়ে নেবে।' হযরত সোলায়মান বললেন : 'তোমার ইচ্ছা কী, বল।' সে বলল : 'আমি চাই আপনি আমাকে রক্ষা করুন এবং বায়ুকে আদেশ করুন যেন সে আমাকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পৌঁছে দেয়।' সোলায়মান বায়ুকে আদেশ করলেন। বায়ু তাই করল। কিছুদিন পর মালাকুল মাওত পুনরায় দরবারে আগমন করলে সোলায়মান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তুমি আমার অমুক সাহাবীর প্রতি বারবার তাকাচ্ছিলে। এর কারণ কী?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছিল আমি অমুক সময়ে পৃথিবীর অমুক প্রান্তে তার রূহ কবয করব। এমতাবস্থায় তাকে আপনার দরবারে উপস্থিত দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানেই পেয়েছি।' এর মান হলো মৃত্যু থেকে পালানোর কোন সুযোগই নেই। মহান আল্লাহ বলেন :

أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গেও অবস্থান কর।'[২৪]

আমরা মৃত্যুকে কিভাবে চাই?

যখন আমরা রাতে ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমরা কেউ কি এটা নিশ্চিত করে বলতে পারব আগামীকাল সূর্যের আলো দেখতে পাব অথবা আমার ঘরে কান্নার রোল উঠবে না? তবে কি আমরা প্রস্তুত হব না?

ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন : এক বাদশাহ কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। সে প্রথমে পোশাক আনতে বলল। পোশাক ভালো মনে হলো না। অন্য পোশাক আনতে বলল। এভাবে সে সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক জোড়াটি পরিধান করল। এমনিভাবে সে সওয়ারীসমূহের মধ্যে যেটি সর্বোত্তম ছিল, সেটিতে আরোহণ করলেন। এরপর শয়তান এসে তার নাকের ছিদ্র পথে ফুঁ মেরে তাকে গর্ব ও অহংকারে পূর্ণ করে দিল। বাদশাহ লশকর সমভিব্যাহারে গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হলো। গর্ব ও অহংকারের আতিশয্যে কারও প্রতি তার দৃষ্টি পড়ত না। ইতিমধ্যে তার কাছে কাছে সেকেলে গাছের এক ব্যক্তি এসে সালাম করল। বাদশাহ সালামের জওয়াব দিল না। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরল। বাদশাহ বলল : লাগাম ছেড়ে দে। তুই চরম ধৃষ্টতা করেছিস। লোকটি বলল : তোমা সাথে আমার কাজ আছে। বাদশাহ : আচ্ছ, বল কি বলবি। লোকটি বলল : গোপন কথা বলব। বাদশাহ মাথা নত করলে সে তার কানে আস্তে বলল : আমি মালাকুল মওত। বাদশাহের মুখমন্ডল ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে কম্পিত স্বরে বলল : আমাকে সময় দাও, যাতে আমি ঘরে ফিরে প্রয়োজন সেরে নিতে পারে এবং পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিতে পারি। সে বলল : এখন সময় নেই। আপন ঘর ও পরিবার-পরিজনকে দেখা তোমার ভাগ্য হবে না। এরপর মালাকুল মওত তার রূহ কবয করে নিল। সে কাঠের ন্যায় মাটিতে পড়ে গেল।

এরপর মালাকুল মাওত সামনে এগিয়ে গিয়ে এক ঈমানদারের সাথে মিলিত হলো। তাকে সালাম করলে সে সালামের জওয়াব দিল। মালাকুল মাওত বলল : আমাকে তোমার কানে কানে কিছু কথা বলতে হবে। সে বলল : খুব ভালো। সে আস্তে কানে বলে দিল : আমি মালাকুল মাওত। মুমিন বলল : চমৎকার! আমি দীর্ঘদিন ধরে আপনারই অপেক্ষায় ছিলাম। ভূপৃষ্ঠে এমন কেউ নেই, যার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি ততটুকু আগ্রহান্বিত, যতটুকু আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আগ্রহান্বিত।

মালাকুল মাওত বলল : যে প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হয়েছ, তা পূর্ণ করে নাও। সে বলল : আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের চেয়ে বেশি আমার অন্য কোন প্রিয় কাজ নেই। মালাকুল মওত বলল : রূহ কবয করার জন্য তুমি নিজের কোন অবস্থা পছন্দ করে নাও। সে বলল : আমাকে ওযু করে নামায পড়ার সময় দিন। যখন আমি সিজদায় থাকি, তখন আমার রূহ কবয করবেন। মালাকুল মাওত তাই করল।[২৫]

আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে এ গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি যে, আমরা কেমনভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রয়েছি– সেই বাদশার মতো নাকি সেই ঈমানদার ব্যক্তির মতো? আমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন্ ধরনের মৃত্যু আমরা কামনা করি।

মৃত্যুর সময়ের অবস্থা

যারা অবিশ্বাসী তাদের মৃত্যুর সময় খুব কঠিন হবে আর যারা মুমিন তাদের মৃত্যু অবস্থা হবে সহজ। পবিত্র কুরআন বলছে :

وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا ۝١ وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ۝٢

'শপথ তাদের যারা (অবিশ্বাসীদের) প্রাণ নির্মমভাবে টেনে বের করে, শপথ তাদের যারা (বিশ্বাসীদের) প্রাণ মৃদুভাবে বের করে নেয়।'[২৬]

মৃত্যু সম্পর্কিত কিছু বাণী

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপদেশ

কাইস ইবনে আসিম বলেন : 'বনু তামীম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ও আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম : হে রাসূলুল্লাহ! যেহেতু আমরা সবসময় আপনার সাথে থাকি না এবং আমরা মরুভূমিতে বসবাস করি, অনুগ্রহ করে আমাদের কিছু উপদেশ দিন যাতে আমরা সঠিক পথে চলতে পারি। মহানবী (সা.) বললেন : হে কাইস! প্রতিটি সৌভাগ্যের সাথে দুর্ভাগ্যও রয়েছে; জীবনের সাথে মৃত্যু এবং এ পৃথিবীর সাথে পরকাল। আমাদের প্রত্যেককে আমরা যা করি তার হিসাব দিতে হবে ভালো বা মন্দের। তুমি অবশ্যই একজনের সঙ্গ লাভ করবে যাকে তোমার

সাথে কবরে রাখা হবে। তুমি মৃত, কিন্তু সে জীবিত। সে যদি সহৃদয় হয় তাহলে তোমাকে আদর করবে, যদি সে হতভাগ্য হয় সে তোমার বিদ্রোহী হবে। তারপর তোমরা কিয়ামতের দিন একত্রে উপস্থিত হবে। তোমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাই সঠিক ব্যক্তিকে বেছে নাও। যদি সে সৎকর্মপরায়ণ হয় তুমি তাকে সঙ্গ দেবে এবং যদি সে অসৎকর্মপরায়ণ হয় তুমি তাকে ভয় করবে। আর সে হলো তোমারই কর্ম।'

ইমাম আলী (আ.)

ইমাম আলী (আ.) এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন : 'আমি তোমাকে সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করতে এবং এর প্রতি অমনোযোগিতা কমিয়ে ফেলতে উপদেশ দিচ্ছি। তুমি কিভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করবে যখন এটি তোমার পেছনে রয়েছে? তুমি কিভাবে মৃত্যুর ফেরেশতা থেকে পালাবে যখন সে তোমাকে আরেকটি সুযোগ দেবে না? যে মৃত ব্যক্তিগুলোকে তুমি প্রত্যক্ষ করেছ তারাই তোমার উপদেশ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। তোমরা তাদের কবরে নিয়ে গিয়েছো। তারা নিজেরা যেতে পারেনি; তোমরা তাদেরকে কবরে শুইয়ে দিয়েছ, তারা নিজেদের থেকে তা করতে পারেনি। মনে হয় তারা যেন কখনো এ পৃথিবীতে বসবাস করেনি এবং পরকালই তাদের আবাসস্থল ছিল। তারা যে স্থানকে সরগরম করে বসবাস করতো তা নির্জন করে চলে গেছে, আর যে স্থানকে নির্জন মনে করতো সেখানে গিয়ে বসবাস করছে। যা পরিত্যাগ করতে হবে তারা তা নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং যে স্থানে যেতে হবে সে স্থানকে বেমালুম ভুলেই ছিল। এখন তারা তাদের পাপ স্খলন করতে পারছে না এবং তাদের পুণ্য এতটুকুও বাড়াতে পারছে না। তারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল এবং দুনিয়া তাদেরকে নিদারুণভাবে বঞ্চনা করেছে। তারা দুনিয়াকে বিশ্বাস করেছিল, এখন দুনিয়া তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হোন। যে ঘরে চিরস্থায়ীভাবে থাকার আদেশ করা হয়েছে সেদিকে দ্রুত এগিয়ে থাকার প্রস্তুতি গ্রহণ করো। কারণ, সেদিকে প্রতিনিয়ত তোমাদেরকে আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ধৈর্য সহকারে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করো এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে তোমাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ আনকূল্য যাচাই করো। কারণ, আগামীকাল তোমাদের জন্য আজই রুদ্ধ হতে পারে। লক্ষ্য করো দিনের

ঘণ্টাগুলো, মাসের দিনগুলো, বছরের মাসগুলো এবং জীবনের বছরগুলো কত দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে!'[২৭]

ইমাম (আ.) বলেন : নিশ্চয় দুনিয়া প্রস্থান করেছে এবং পশ্চাৎ প্রদর্শন করেছে আর পরকাল রওয়ানা হয়েছে এবং এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকেরই সন্তানাদি রয়েছে। তোমরা পরকালের সন্তান হও। দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। দুনিয়া থেকে আত্মসংযমী হবে এবং পরকাল অভিমুখী হবে। কারণ, পরহেযগাররা আল্লাহ্‌র পৃথিবীকে জীবনের ময়দান আর মাটিকে বিছানা বানায়। আর মাটির ঢিলাকে মাথার বালিশ এবং পানিকে সুগন্ধী হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর পৃথিবীতে নির্বিঘ্ন জীবন কাটানোর চিন্তা ত্যাগ করেছে। জেনে রাখ, যে বেহেশতের প্রতি আসক্ত থাকে সে ভালো কাজে ধাবিত হয় এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত হয়। যে ব্যক্তি দোযখের ভয় করে সে তার গোনাহ থেকে তওবা করার জন্য আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয় এবং হারামসমূহ থেকে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরহেযগার হয় তার জন্য সব বিপদই সহজ এবং তাকে অকল্যাণকর ভাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জন্য এমন সব বান্দা রয়েছে যাদের অন্তর পরকালের প্রতি আসক্ত এবং তার সওয়াবের প্রতি ঝুঁকে থাকে। আর তারা তাদের মতো যারা বেহেশতবাসীদের বেহেশতে চিরস্থায়ী অবস্থায় দেখছে আর তাদের মতো যারা দোযখবাসীদের দোযখে চিরস্থায়ী আযাবের অবস্থায় দেখছে। তারা হলো এমন যারা জনগণের অনিষ্ট ও অবাঞ্ছিত বিষয়াদি থেকে বিমুক্ত। কারণ, তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্‌র ভয়ে জনগণের দিকে মনোযোগী নয়। তারা নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে দৃষ্টিসমূহকে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং জনগণের প্রতি মুখাপেক্ষিতা সামান্যই রাখে। আল্লাহ্‌র থেকে অল্প জীবিকাকেই গ্রহণ করে নিয়েছে। ঐটাই তাদের রুজি। কয়েকটা দিন তারা ধৈর্যধারণ করেছে কিয়ামত দিনের দীর্ঘ আফসোসের জায়গায়।

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বাণী

আমি তোমাদের আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার উপদেশ দান করছি আর তাঁর (শাস্তির) দিনসমূহ থেকে সতর্ক করছি এবং তাঁর প্রতীক ও নিদর্শনসমূহকে তোমাদের জন্য সমুন্নত করছি এমনভাবে যে, যেন যা ভীতিকর; তা তার ভয়ানক আগমন, অচেনা পদার্পণ এবং তিক্তকর স্বাদসহ তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে আর তোমাদের ও তোমাদের আমলের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমরা সুস্থ শরীরে তোমাদের আয়ুষ্কালের মধ্যেই আমলে ধাবিত হও, যেন অকস্মাৎই মৃত্যু হানা দিবে আর

তোমাদেরকে মাটির ওপর থেকে মাটির মধ্যে টেনে নিবে এবং মাটির টিলা থেকে গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করবে এবং সঙ্গী-সাথি ও প্রশান্তি থেকে ভয় ও নিঃসঙ্গতায় নিয়ে যাবে এবং খোলা আকাশ ও আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে। আর প্রশস্ত জায়গা থেকে সংকীর্ণতার মধ্যে ঠেলে দিবে যেখানে আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে যাওয়া হয় না, অসুস্থকেও দেখতে যাওয়া হয় না আর না কোনো ফরিয়াদে সাড়া দেওয়া হয়। আল্লাহ্ আমাদের এই দিনের ভয় থেকে সাহায্য করুন আর আমাদের ও তোমাদের তাঁর শাস্তি থেকে নাজাত দিন এবং আমাদের ও তোমাদের জন্য তাঁর সমুচিত সওয়াব আবশ্যক করুন।

ইমাম যায়নুল (আ.)-এর বাণী

এক ব্যক্তি ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর কাছে এসে তার সমস্যাদির বিষয়ে অভিযোগ করল। ইমাম বললেন : 'আদমসন্তানরা হতভাগা। কারণ, প্রতিদিন তারা তিনটি বিপজ্জনক শত্রুর মুখোমুখি হয়, কিন্তু তারা এ থেকে শিক্ষা লাভ করে না। যদি তারা এগুলো থেকে শিক্ষা নেয় তাহলে তাদের অসংযত বিষয়কে দমন করা সহজ হবে। প্রথমত প্রতিদিন তার আয়ু কমে আসছে। যদি তার সম্পদ কমে যায় সে হতাশাগ্রস্ত হয়। কিন্তু তার জানা উচিত পার্থিব সম্পদের বিকল্প আছে, কিন্তু জীবনের কোন বিকল্প নেই। দ্বিতীয়ত প্রতিদিন সে তার রুজি উপভোগ সম্পূর্ণ করে। যদি তা বৈধভাবে হয়ে থাকে তাহলে সে পুরস্কৃত হবে, আর যদি তা অবৈধভাবে হয়ে থাকে তাহলে সে শাস্তি পাবে। তৃতীয়ত আর এটি অন্য দু'টির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যখন সে একটি দিন অতিবাহিত করে তখন সে আসলে পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু জানে যে, সে কি জান্নাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে নাকি জাহান্নামের দিকে।

তথ্যসূত্র

১. নাহজুল ফাসাহা : ৪৪৪ গোনাহ পরিচিতি মুহসিন কারাআতী, পৃ. ১৯৬; এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, পৃ. ২৪৭
২. ফেহরেস্তে গুরার- মাওত, গোনাহ পরিচিতি, মুহসিন কারাআতী, পৃ. ১৯৬
৩. Imam Ali's First Treatise on The Islamic Ethics and Education by Zainol Aabedeen Qorbani Lahiji, p. 135
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. 136
৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত, আলমুহাজ্জাজা বাইযাহ, খণ্ড ৮, পৃ. ২৪১; মদীনা পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭

৭. Imam Ali's First Treatise on The Islamic Ethics and Education by Zainol Aabedeen Qorbani Lahiji, p. 136 আলমুহাজ্জাজা বাইযাহ, খণ্ড ৮, পৃ. ২৪১; এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭

৮. Imam Ali's First Treatise on The Islamic Ethics and Education by Zainol Aabedeen Qorbani Lahiji, p. 136 মিসবাহুশ শারীয়াহ, পৃ. ৪৫৭

৯. নাহজুল বালাগা, খুতবা : ৫

১০. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬১

১১. Imam Ali's First Treatise on The Islamic Ethics and Education by Zainol Aabedeen Qorbani Lahiji, p. 135 গুরারুল হিকাম,

১২. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭

১৩. Imam Ali's First Treatise on The Islamic Ethics and Education by Zainol Aabedeen Qorbani Lahiji, p. 137 মিসবাহুশ শারীয়াহ, পৃ. ৪৫৮; এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪

১৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৮১

১৫. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ১৯২

১৬. মানাক্বিব : ইবনে শাহ্‌র আশূব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮

১৭. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭

১৮. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮

১৯. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ২২৪, পৃ. ৩০৪

২০. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮

২১. সূরা মুল্‌ক : ২

২২. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯

২৩. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ৬৩, পৃ. ৮৮

২৪. সূরা নিসা : ৭৮

২৫. এহইয়া-৫ম খণ্ড, পৃ.২৬৭-২৬৮

২৬. সূরা নাযিয়াত : ১-২

২৭. নাহজুল বালাগাহ, খুতবা নং ১৮৮

ধর্ম ও দর্শন

কোরআনর মজীদের কতিপয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

কোরআন ও জীবনের প্রকৃতি

মেরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান

সৃষ্টিতে ‘বাদা’ প্রসঙ্গ

শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহ্হারীর দর্শনচিন্তায় মানব জীবনে ধর্মের অবদান

কুরআন মজিদের কতিপয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

কাজেম মুদীর শনেচী

[কাজেম মুদীর শনেচী ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অন্যতম খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক। তাঁর রচিত 'ইলমুল হাদীস ও দেরায়াতুল হাদীস' (হাদীস-বিজ্ঞান ও হাদীস বিচার) ইরানে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বহুল অধ্যয়নকৃত একটি মহামূল্য গ্রন্থ। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি ধর্মীয় নগরী মাশহাদ থেকে প্রকাশিত 'মিশকাত' নামক ফারসি সাময়িকীতে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়।]

নিঃসন্দেহে কুরআনে মজিদ হচ্ছে সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ, অন্য কোন গ্রন্থই এত বেশি আলোচিত হয়নি। এ গ্রন্থ সম্পর্কে রচিত তাফসীর, ভাষা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পরিচিতি গ্রন্থ অন্য যে কোন গ্রন্থ সম্পর্কিত রচনাবলিকে ছাড়িয়ে গেছে। তাওরাত ও ইঞ্জিল যদিও বেশি সংখ্যক ভাষায় অনূদিত হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকাণ থেকে অধ্যয়ন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ভাষ্যের সংখ্যা এবং এর বিভিন্ন দিক-যে সম্পর্কে সুদীর্ঘ অতীত থেকে ব্যাপকভাবে আলোচনা ও প্রচুর পরিাণে লেখা হয়েছে-এসবের বিচারে কুরআন মজিদের অবস্থান অন্য সমস্ত গ্রন্থের শীর্ষে। এমনকি প্রচারিত কপি সংখ্যার বিচারেও কুরআন মজিদ অন্য সকল গ্রন্থের ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে।

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, কুরআনে করীমের কপিকরণ ও তেলাওয়াতেই শুধু সওয়াব হয় না; বরং এ পবিত্র গ্রন্থের প্রতি (সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে বা মুহব্বতের সাথে) দৃষ্টিপাত করাতেও সওয়াব রয়েছে। ফলত আমরা জানি যে, এমন অনেক মুসলমান ছিলেন বা আছেন যাঁদের প্রত্যেকে শুধু সওয়াবের উদ্দেশ্যে স্বহস্তে কুরআন মজিদের শতাধিক কপি করেছেন। আর অনেকে মুসুল্লী ও জিয়ারতকারীদের কুরআন তেলাওয়াতে সাহায্য করার লক্ষ্যে এ গ্রন্থের শত শত কপি ক্রয় করে বিভিন্ন মসজিদে-মাজারে দান করেছেন। বিশেষ করে ইরানে একটি সুপ্রাচীন রীতি হচ্ছে কুরআন খতমের অনুষ্ঠান

(যাতে কয়েকজন মিলে সমগ্র কুরআন মজিদ একই বৈঠকে তেলাওয়াত সমাপ্ত করে)। এ অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতের জন্য কুরআন মজিদের কপিকে সাধারণত তিরিশ, ষাট বা একশ বিশ অংশে বিভক্ত করে আলাদাভাবে বাঁধাই করে রাখা হয়, এসব কপিসহ হিসাব করলে কুরআন মজিদের মুদ্রিত ও হস্তলিখিত কপি সংখ্যা এক বিস্ময়কর বিরাট সংখ্যায় পরিণত হবে। সেই সাথে বহুপূর্ব থেকে প্রচলিত দীনী শিক্ষাকেন্দ্র মক্তবসমূহের ছাত্রদের কুরআন শিক্ষা করতে গিয়ে কুরআনের যে হস্তলিখিত কপি করতে হয় তা যোগ করলে এ সংখ্যা আসলেই বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

হাতে লিখে কুরআন মজিদের কপিকরণ স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর যুগ থেকেই শুরু হয়। তিনি কুরআন মজিদ লিপিবদ্ধ করার জন্য কয়েকজন সাহাবীকে নিয়োগ করেন। হযরত রাসূলে আকরামের প্রতি যখন কোন ওহি নাযিল হতো সাথে সাথেই তিনি তা তেলাওয়াত করতেন এবং উক্ত নির্ধারিত লেখকগণ তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। তাঁরা 'কুত্তাব-ই-ওহি' (ওহি লিপিবদ্ধকারিগণ) নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর সচিবগণ থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সচিবগণ তাঁর পক্ষ থেকে চিঠিপত্র, ফরমান, চুক্তি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতেন অথবা তাঁর উপস্থিতিতে দুইপক্ষের মধ্যে চুক্তির খসড়া লিপিবদ্ধ করতেন।[১]

কুরআনের সংকলকগণ

ইবনে নাদিম লিখেছেন, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে আলী ইবনে আবি তালিব (আ.), সা'দ ইবনে উবাইদ ইবনে নু'মান, আবু দারদা, মু'আয ইবনে জাবাল, সাবিত ইবনে যায়িদ[২] এবং উবাইদ ইবনে মুআবিয়া ইবনে যায়িদ (রা.) রাসূলে আকরাম (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই কুরআন মজিদ সংকলন করেন।[৩]

ইমাম বুখারী আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উবাই ইবনে কা'ব, মু'আয, যায়িদ ইবনে সাবিত ও আবু যায়িদ হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর যুগে[৪] কুরআন সংকলন করেন। অন্য এক হাদীসে তিনি এ প্রসঙ্গে আবু দারদা, মু'আয ইবনে জাবাল, যায়িদ ইবনে সাবিত এবং আবু যায়িদ-এর নাম উল্লেখ করেছেন।[৫]

জারাকশী[৬] শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর জীবদ্দশায় ছয় ব্যক্তি কুরআন মজিদ সংকলন করেন। তাঁরা হলেন উবাই, যায়িদ, মু'আয, আবু দারদা, সাঈদ ইবনে উবাইদ এবং আবু যায়িদ (রা.)। এছাড়া মু'জাশা ইবনে জারিয়াহ দু'টি সুরা বাদে কুরআনের বাকি সূরাসমূহ সংকলন করেন।

ইবনে নাদিম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও উবাই ইবনে কা'বের সংকলিত কুরআন মজিদের সূরাসমূহের বিন্যাস সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যায় যে, ইবনে মাসউদও কুরআন সংকলন করেছিলেন,[৭] অবশ্য হতে পারে যে, তিনি হযরত রাসূলে আকরামের ইন্তেকালের পরে এটি সংকলন করেছিলেন।

'আল-তামহীদ' গ্রন্থে আবু মূসা আশআরী ও মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকেও কুরআন মজিদের সংকলনকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলিফা হযরত উসমান কর্তৃক কুরআন মজিদের নির্ভুল কপি বিতরণের পূর্বে কুফার লোকেরা ইবনে মাসউদের কপি অনুযায়ী, দামেশকের লোকেরা মিকদাদের কপি অনুযায়ী এবং সিরিয়ার অন্যান্য এলাকার লোকেরা উবাই ইবনে কা'বের কপি অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করত।[৮]

ইবনে নাদিম, ইয়াকুবী এবং অনেক শিয়া হাদীস শাস্ত্রবিদ হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (আ.) কর্তৃক কুরআন মজিদ সংকলনের ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। ইয়াকুবী তাঁর ইতিহাসে[৯] হযরত আলী (আ.)-এর মাসহাফে কুরআন মজিদের সূরাসমূহের যে বিন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন তা ইবনে নাদিম কর্তৃক উল্লিখিত[১০] ইবনে মাসউদ ও উবাই বিন কা'বের কপির বিন্যাস থেকে ভিন্নতর। এ ছাড়া কুরআন মজিদের সূরাসমূহের বহুল পরিচিত ও বর্তমানে ব্যবহৃত নামসমূহে কিঞ্চিত পার্থক্য দেখা যায়।[১১] উপরোক্ত মাসহাফসমূহে বিভিন্ন সূরার পর্যায়ক্রমের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে মাসউদর মাসহাফে সূরা আনফালের ক্রমিক নং হচ্ছে ২৫, অন্যদিকে উবাই বিন কা'বের মাসহাফে এর ক্রমিক নং হচ্ছে ৯ এবং বর্তমানে প্রচলিত সংকলনে এর ক্রমিক নং ৮। আর বর্তমান মাসহাফ হচ্ছে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের নির্দেশে যায়িদ বিন সাবিত কর্তৃক সংকলিত।

জায়িদ বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধের পর আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠান। উক্ত যুদ্ধে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর অনেক সাহাবী ও ক্বারীয়ে-কুরআন নিহত হন।

তিনি আমাকে বললেন, ওমর যে এখন এখানে উপবিষ্ট আছে-বলছে যে, ইয়ামামায় কুরআনের অনেক কারী শহীদ হয়েছেন। যদি অনুরূপ আরেকটি ঘটনা সংঘটিত হয় তাহলে তাঁদের মুখস্থকৃত কুরআনের অংশবিশেষ হারিয়ে যেতে পারে। আর তুমি যেহেতু অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক এবং ওহির লিপিকারদের অন্যতম, তেমনি নির্ভরযোগ্য লোক, সেহেতু আমি তোমাকে কুরআন সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করছি। অতঃপর আমি মূল সূত্রসমূহ এবং লোকদের থেকে কুরআন সংকলন করি।[১২]

ইয়াকুবীর মতে, কুরাইশ গোত্রের ২৫ জন এবং আনসারদের মধ্য থেকে ৫০ ব্যক্তি এ কাজে যায়িদকে সাহায্য করেন।[১৩] এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও আবদুর রহমান বিন হারিস বিন হিশাম ছিলেন সংশ্লিষ্ট কমিটির স্থায়ী সদস্য।

'আল-তাহমীদ' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, যায়িদ বিন সাবিত অপর কয়েকজনের সাথে মিলে কাজ শুরু করেন। কিন্তু পরে উবাই বিন কা'ব পঠনের এবং যায়িদ লিপিবদ্ধকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মোট কথা, এভাবে কুরআন সংকলিত হয় এবং সংকলিত কপিটি প্রথমে হযরত আবু বকরের নিকট ও পরে তা হযরত ওমরের নিকট রাখা হয়, আর তা লোকদের জন্য কুরআন মজিদের স্ব স্ব কপি যাচাই করার সূত্রে পরিণত হয়। হযরত ওমরের ইন্তেকালের পর কুরআন মজিদের এ কপিটি তাঁর কন্যা হযরত হাফছার নিকট রাখা হয় এবং হিজরি ২২ সাল মোতাবেক ৬৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা এ অবস্থায় থাকে। অতঃপর হযরত উসমানের শাসনামলে কুরআন মজিদের তেলাওয়াতে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে খলিফার নির্দেশে হযরত হাফছার নিকট থেকে কুরআনের পূর্বোক্ত কপিটি গ্রহণ করা হয় এবং এর প্রধান লিপিকার যায়িদ বিন সাবিত ও কুরআন সংকলনকারী মূল কমিটির দুই সদস্য আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও আবদুর রহমান বিন হিশাম এবং সাইদ বিন আল-আস এর সহযোগিতায় কয়েকটি কপি তৈরি করেন। অতঃপর মূল কপিটি হযরত হাফছার নিকট ফেরত দেয়া হয়। অন্যান্য কপি থেকে একটি কপি মদীনায় খলিফার নিকট রাখা হয় এবং বাকি কপিগুলো ইসলামী খেলাফতের প্রধান শহরগুলোতে প্রেরণ করা হয়।[১৪] অতঃপর কুরআনের লিপি ও পঠন সংক্রান্ত বিভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে খলিফার নির্দেশে কুরআনের অন্যান্য হস্তলিখিত কপি নষ্ট করে দেয়া হয়।[১৫]

হযরত আবু বকরের সময়ে সংকলিত কুরআন মজিদের কপি মারওয়ান ইবনে হাকামের যুগ পর্যন্ত হযরত হাফছার নিকট সংরক্ষিত থাকে। মারওয়ান কুরআন মজিদের এ কপিটিও পুড়িয়ে ফেলতে চায়, কিন্তু হযরত হাফছা কপিটি তার নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন। ফলে তাকে হযরত হাফছার ইন্তেকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, অতঃপর এ সংকলনটি ধ্বংস করা হয়।[১৬]

এভাবে কুরআন মজিদের কপিসমূহের অভিন্নতা ২২ হিজরি মোতাবেক ৬৪২ খ্রিস্টাব্দেই নিশ্চিত করা হয়।[১৭] যদিও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর সংকলনটি নষ্ট করার জন্য হযরত ওসমানের নিকট হস্তান্তরে অস্বীকার করেন।[১৮] তেমনি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর সংকলনটিও তিনি নিজের নিকট সংরক্ষণ করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরদের নিকট তা সংরক্ষিত থাকে।

কুরআন সংকলনের জন্য হযরত ওসমানের নির্দেশে গঠিত কমিটি এর যেসব কপি তৈরি করেন, বিভিন্ন হাদীস অনুযায়ী আল-মাসহাফুল ইমাম বা মূলকপি ব্যতিরেকে তার সংখ্যা ছিল চার থেকে নয়। এ কপিগুলো কুফা, বসরা, মক্কা, সিরিয়া, বাহরাইন, ইয়ামান, মিশর, আলজেরিয়া ও মদীনায় প্রেরণ করা হয়।[১৯] এই কপিগুলো সংশ্লিষ্ট শহরের জনগনের জন্য কুরআন মজিদের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পরিগণিত হতো, লোকেরা এ কপি থেকে নিজেদের জন্য কুরআন কপি করত এবং তাদের মধ্যে কুরআনের পাঠ নিয়ে কোনরূপ মতপার্থক্য হলে এ কপির ভিত্তিতে তা নিরসন করত। আর কখনো যদি বিভিন্ন শহরের মাসহাফের মধ্যে কোন ক্ষুদ্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো, সে ক্ষেত্রে মদীনাস্থ কুরআন (আল-মাসহাফুল ইমাম)-ই হতো চূড়ান্ত মানদণ্ড।

হযরত উসমান প্রতিটি শহরে কুরআনের কপি প্রেরণের সাথে সাথে লোকদের সঠিক উচ্চারণ-এ তেলাওয়াত শিক্ষা দেয়ার জন্য একজন করে কারীও প্রেরণ করেন। মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে সা'ইব, সিরিয়ায় মুনিরাহ ইবনে শিহাব, কুফায় আবু আবদুল্লাহ সালামী, বসরায় আমির ইবনে আবদিল কায়স (বা আমির ইবনে আবদির রাহমান) এবং মদীনায় যায়িদ ইবনে সাবিত কুরআনের পাঠ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বশীল ছিলেন।[২০]

'মাসহাফে উসমানী' বা 'উসমানী সংকলন' নামে খ্যাত কুরআন মজিদের উপরোক্ত কপিসমূহ বহুদিন যাবৎ সংরক্ষিত থাকে। ইয়াকুত আল-হামাভী (ওফাত ৬২৬ হি./১২২৮ খ্রি.) তাঁর 'মু'জামুল বুলদান'-[২১] এ লিখেছেন যে, এক কপি উসমানী

সংকলন দামেশকের জামে মসজিদে ছিল। 'মাসালিকুল আবছার'-এর লেখক ইবনে ফাজলিল্লাহ আল-উমরীও (ওফাত ৭৪৯ হি./১৩৪৮ খ্রি.) দামেশকের সংকলনের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসির (ওফাত ৭৭৪ হি./১৩৭২ খ্রি.) এটি দেখেছেন এবং এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।[২২] ইবনে বতুতাহ (ওফাত ৭৭৮ হি./১৩৭৬ খ্রি.) তাঁর এতদসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে লিখেছেন :

'মেহরাবের মুখোমুখি নামাযখানার পূর্বপার্শ্বে একটি সংরক্ষণাগার রয়েছে; আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান কর্তৃক প্রেরিত কুরআন এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। এ সংরক্ষণাগারটি জুমআ নামাযের পর খোলা হয় এবং লোকেরা কুরআনের এ কপিটি স্পর্শ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিভিন্ন বিরোধের ক্ষেত্রে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতারা এখানে এসে শপথ গ্রহণ করে থাকে।

কুর্দ আলীর[২৪] মতে, ১৩১০ হি./১৮৯২ খ্রি. পর্যন্ত এ কুরআনটি দামেশকের মসজিদে মওজুদ ছিল, অতঃপর ঐ বছর তা মসজিদের অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায়।

ড. রামিয়ার (অবশ্য কোন সূত্র উল্লেখ ছাড়াই) লিখেছেন : 'উসমানী সংকলন হিসাবে বিবেচিত কুরআনের কয়েকটি সূরার অংশবিশেষ আমীর তৈমুর গোরকানী স্বীয় সমাধিতে রাখার উদ্দেশ্যে সিরিয়া থেকে সমরকন্দে নিয়ে যান বলে মনে হয়। এ পাণ্ডুলিপি পরে লেনিনগ্রাদের ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউট অব আর্কিওলোজীর গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৫ সি.ই.-তে এর ৫০টি লিথোগ্রাফিক কপি করা হয় এবং এর ২৫টি কপি বিভিন্ন মুসলিম দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[২৫]

ইবনে বতুতা কুফার মসজিদে হযরত উসমানের স্মৃতিযুক্ত আরেকটি কুরআন দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন; এতে তাঁর (উসমানের) রক্তমাখা রয়েছে।

নাবুলুসী (ওফাত ১১০৫ হি./১৬৯৩ খ্রি.) থেকে এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সিরিয়ার হুমস-এর প্রাচীন দুর্গস্থ মসজিদের মেহরাবে কুফী হরফে লিখিত রক্তমাখা এক জেলদ কুরআন ছিল। নাবুলুসীর সময় খরা দেখা দিলে লোকেরা বৃষ্টির জন্য মুনাজাতে এ কুরআনকে উসিলা করত।[২৬]

উসমানী মুসহাফ রূপে পরিচিত কুরআনের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন শহরে বিদ্যমান ছিল; বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ অনুযায়ী এরূপ পাণ্ডুলিপির সংখ্যা হচ্ছে ষোলটি।[২৭]

এমনকি উসমানী সংকলন (মুসহাফে উসমানী) হিসাবে পরিগণিত কুরআনের কয়েকটি কপি মিশর, তুরস্ক ও তাশখন্দে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. কুরআনের মিশরস্থ পাণ্ডুলিপিটি কায়রোর আলমাশহাদুল হুসাইনী-র সংরক্ষণাগারে রাখা হয়েছে। এটি হচ্ছে কুফী হরফে লিখিত একটি বিরাটাকারের পাণ্ডুলিপি।

২. তরস্কস্থ পাণ্ডুলিপিটি প্রথমে (ইরাকের) মসুলে ছিল এবং পরে তা হানাদার তাতারদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে তা উসামনীদের রাজধানী ইস্তাম্বুলে ফেরত দেয়া হয়। বর্তমানে এটি আলআমানাহ সংগ্রহের এক নং ক্রমিকের অধীনে সংরক্ষিত আছে। কায়রোর মা'দাদুল মাখতুতাতিল আ'রাবিয়াহ-তে ক্রমিক নং ১৯-এর অধীনে এর একটি মাইক্রোফিল্ম সংরক্ষিত আছে।

৩. তাশখন্দের পাণ্ডুলিপিটি তৈমুর কর্তৃক সিরিয়া থেকে লুণ্ঠন করে উজবেকিস্তানে আনয়ন করা হয় এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী সমরকন্দে তাঁর সমাধিতে রাখা হয় বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে এটি রাশিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী পেট্রোগাদে (লেনিনগ্রাদে) স্থানান্তরিত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিনের নির্দেশে এটি পুনরায় তাশখন্দে ফেরত পাঠানো হয় এবং এখনো তা সেখানেই আছে। ড. রামিয়ারের তারিখে কুরআন-এ[২৮] এই স্থানান্তরের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য এর সূত্র হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা। ড. সুবহি আসসালিহ এ প্রসঙ্গে বলেন : 'অনেক গবেষকের মতে, উজবেকিস্তানে স্থানান্তরিত হবার পূর্বে এ কপিটি দীর্ঘকাল যাবৎ লেনিনগ্রাদের ইম্পেরিয়াল মিউজিয়ামে ছিল।'[২৯] এ ব্যাপারে বিস্তাতির জানার জন্য Chavin এর Bibliographie des ourages Arabesou relatifs aux Arabes (Liege)-এর দশম খণ্ডের ৪৫ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য পাঠক-পাঠিকাদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে, অন্যান্য গবেষক মনে করেন, এ মুসহাফটি ২৩১০ হি./১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দামেশকের জুমআ মসজিদে সংরক্ষিত ছিল।[৩০]

আমরা জানি যে, তৈমুর ৮০৩ হি./১৪০০ খ্রিস্টাব্দে দামেশক জয় করেন আর সে বিজয়ের বছরেই তাঁর সৈন্যবাহিনী শহরটি লুণ্ঠন করে ও এতে অগ্নি সংযোগ করে। যদিও তৈমুরের পক্ষ থেকে জামে মসজিদে হামলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল তথাপি মসজিদটির কাঠের তৈরি ছাদে আগুন লেগে যায় এবং এর পূর্ব

দিককার মিনার পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদিও আ'রুস নামক মিনারটি (যে সম্পর্কে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে) রক্ষা পায়।[৩১]

অতএব, প্রমাণ করা চলে যে, দামেশকের মসজিদে অগ্নিকাণ্ডের পূর্বেই তৈমুর কুরআন মজিদের উক্ত কপিটি তাঁর নিজ শিবিরে নিয়ে যান এবং পরে তা তাঁর রাজধানী সমরকন্দে স্থানান্তর করা হয়। অন্যথায় দামেশক এং সেখানকার জামে মসজিদে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় তার হাত থেকে এ মুসহাফটির রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

ড. সুবহি আসসালিহ যে খুতাতুশশাম-এর বরাত দিয়ে বলেছেন, মুসহাফটি ১৩১০ হিজরি পর্যন্ত দামেশকে ছিল সে প্রসঙ্গে বলতে হয়, এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, সিরিয়ায় তৈমুরের আধিপত্যের অবসান এবং মামলুক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর হুমসের উসমানী কুরআন, নাবুলুসীর বক্তব্য অনুযায়ী যা হুমসের প্রাচীন দুর্গে সংরক্ষিত ছিল, দামেশকে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

তৈমুরের অধীনতা স্বীকার ও তাঁকে করদানে স্বীকৃত হওয়ায় হুমস নগরী ৮০৩ হি./১৪০০ খ্রিস্টাব্দের তৈমুর বাহিনীর আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়।[৩২] এ কারণে এ সম্ভাবনাই বেশি যে, দামেশকের মুসহাফ বহু জায়গায় পরিভ্রমণের পরে শেষ পর্যন্ত তাশখন্দে আসে এবং সেখানেই থেকে যায় এবং হুমসে স্থানান্তরিত হবার পরে ১৩১০ হি./১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে সংশ্লিষ্ট মসজিদে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

সে যা-ই হোক, তাশখন্দস্থ উজবেকিস্তানের ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অত্র লেখককে বলেছেন যে, উক্ত মুসহাফটি তাশখন্দের প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে তালাবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। তবে এর সমান আকারের (৬৫ X ৫০) সে.মি.) একটি ফটোকপি দর্শকদের প্রদর্শনার্থে রাখা হয়েছে।

হযরত আলী (আ.)-এর মুসহাফ

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ওফাতের পর সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কুরআনে মজিদের সংকলনের কাজ শুরু করেন তিনি হচ্ছেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ও অসিয়ত অনুযায়ী তিনি এ কাজে হাত

দেন।[৩৩] তিনি কুরআন মজিদের সূরাসমূহকে নাযিলের ধারাক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করেন এবং তার মর্মার্থ ও তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে তার অবস্থান উল্লেখ করেন।

ইবনে নাদিম লিখেছেন : 'হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ওফাতের পরে হযরত আলী (আ.) শপথ করেন যে, সমগ্র কুরআন সংকলিত না করা পর্যন্ত তিনি তাঁর গৃহ ত্যাগ করবেন না। তিনি তিন দিন স্বীয় গৃহে অবস্থান করেন এবং কুরআন সংকলন করেন। হেফয থেকে কুরআন সংকলনকারী প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন তিনিই। এ কুরআন জা'ফরের পরিবারের তত্ত্বাবধানে থাকে।'[৩৪]

ইবনে নাদিমের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, হযরত নবী করীম (সা.)-এর ওফাতের পূর্বেই হযরত আলী (আ.) কুরআন হেফয করেছিলেন এবং রাসূলের ইন্তেকালের পর তিনি হেফয থেকে তা সংকলিত করেন। সম্ভবত এর কিছু অংশ তিনি পূর্বেই লিখে রেখেছিলেন। কেননা, অত্যন্ত সুদক্ষ লিপিকারের পক্ষেও হেফয থেকে বা অন্য কোন কপি থেকে মাত্র তিন দিনের মধ্যে পুরো কুরআন কপিকরণ সম্ভব হতে পারে না। যেহেতু এরূপ কোন প্রমাণ নেই যে, হযরত আলী (আ.) অন্য কোন কপি থেকে কুরআনের কপি করেছিলেন, সেহেতু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, কুরআন মজিদ নাযিল হওয়ার সময় তিনি নাযিলের ক্রম অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আর যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) হযরত আলী (আ.)-এর এ কাজ অর্থাৎ কুরআন কপিকরণ সম্পর্কে জানতেন, সেহেতু কুরআনকে ধ্বংস ও বিলুপ্তির হাত থেকে হেফাযত এবং অতীতের কিতাবসমূহের ন্যায় বিকৃত হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে তিনি পুরো কুরআন সংকলনের জন্য হরযত আলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইবনে জওজী তাঁর 'আত্তাসহিল'-এ এবং জারাকশী তাঁর 'আল-বুরহান' এ[৩৫] বলেন যে, হযরত রাসূলে আকরামের সময় কুরআন 'ছুহফ' (বিভিন্ন বিভিন্ন পাতা) হিসেবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং সাহাবীদের মস্তিষ্কে হেফয অবস্থায় ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে, যেমন হযরত উসমান ও হযরত আলী (আ.) হযরত রাসূলে আকরামের সামনে নিয়মিত তা তেলাওয়াত করতেন। শেখ মুফিদ তাঁর 'আজওয়িবাতুল মাসায়িলিস সারাওয়িয়াহ' পুস্তকে একই বিষয় উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

ইতিপূর্বেকার বর্ণনায় যে বলা হয়েছে যে, হযরত আলী (আ.) কুরআন মজিদের নাযিলের ক্রম অনুযায়ী এর সংকলন করেন তা থেকে বোঝা যায় যে, কুরআনের ছোট

ছোট সুরাসমূহ যা প্রধানত মক্কায় অবতীর্ণ, এ সংকলনের শুরুর দিকে এবং মদীনায় অবতীর্ণ বড় বড় সূরার পূর্বে স্থান দেয়া হয়েছিল। এ ছাড়া এ সংকলনে বিভিন্ন সূরার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুও উল্লিখিত ছিল এবং নাসেখ ও মানসুখ আয়াতসমূহও চিহ্নিত ছিল।

ইয়াকুবী তাঁর তারিখ-এ (নাজাফ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ১১৩) হযরত আলী (আ.) যে বিন্যাসে সূরাসমূহ লিপিবদ্ধ করেন তার উল্লেখ করেন, অন্যদিকে ইবনে নাদিম তাঁর 'আলফিহরিস্ত'-এ আলী (আ.)-এর মুসহাফ নিয়ে আলোচনাকালে কিছুটা খালি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এ ক্রম লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ্য হননি, যদিও তিনি এ মুসহাফ দেখেছেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (আ.) সূরাগুলোকে ভিন্নতরভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন।

আলী (আ.)-এর মুসহাফ নামে পরিচিত মুসহাফসমূহ

হযরত আলী (আ.)-এর সংকলিত মুসহাফ ইবনে নাদিমের যুগ পর্যন্ত অর্থাৎ হিজরি চতুর্থ শতাব্দী/খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত মওজুত ছিল।[৩৭]

'আলফিহরিস্ত'-এর উল্লেখ অনুযায়ী ইবনে নাদিম আবু ইয়ালা হামজাহ আল-হাসানীর কাছে আলী (আ.)-এর মুসহাফ দেখেছেন এবং হযরত ইমাম হাসান (আ.)-এর পরিবারের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তা তাঁর নিকট সংরক্ষিত ছিল।[৩৮] উপরোক্ত ব্যক্তি সম্ভবত সাইয়্যেদ মুর্তাজার[৩৯] শিষ্য শরীফ আবু ইয়ালা হামজাহ ইবনে জায়িদ ইবনে হুসাইন আল-হাসানী আল-আফতাসী ছিলেন। যেহেতু 'আলফিহরিস্ত' ৩৭৭ হি./৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় এবং সাইয়্যেদ মুর্তাজা সম্ভবত ৩৫৫ হি./৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সেহেতু আবু ইয়ালা কর্তৃক সাইয়্যেদ মুর্তাজার শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বেই ইবনে নাদিমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে থাকবে, কেননা, সাইয়্যেদ মুর্তাজার বয়স ২২ বছর হওয়ার পূবেই আবু ইয়ালা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না।

মিশরস্থ মুসহাফ

আলমাকরিজী (ওফাত ৮৪৫ হি./১৪৪১ খ্রি.) তাঁর 'খুতাতু মিছর'[৪০] গ্রন্থে কায়রোয় ফাতেমী খলিফাদের গ্রন্থাগারে হযরত আলী (আ.) লিখিত এক খণ্ড কুরআন ছিল বলে

উল্লেখ করেছেন। ফাতেমী খলিফা আমীর বিল্লাহর মন্ত্রী, মা'মুন বাতাইহী কর্তৃক এ মুসহাফটির জন্য একটি স্বর্ণের বাক্স তৈরির নির্দেশ দানের পূর্ব পর্যন্ত এটি সেখানকার প্রাচীন মসজিদ (জামি'উল আতিক)-এ একটি রৌপ্য নির্মিত বাক্সে সংরক্ষিত ছিল।[৪১]

বর্তমানে হুসাইন (আ.)-এর কায়রোস্থ সমাধিক্ষেত্রের ঐতিহাসিক গ্রন্থশালায় হযরত আলী (আ.)-এর মুসহাফ হিসাবে বিবেচিত এক খণ্ড কুরআন রয়েছে। অসম্ভব নয় যে, এটি হচ্ছে মিশরের প্রাচীন জামে মসজিদে সংরক্ষিত সেই কুরআন এবং পরে তা এখানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকবে।

নাজাফের মুসহাফ

সাইয়্যেদ জামালুদ্দিন আদদাউদী আল-হাসানী, যিনি ইবনে ইনাবাহ হিসাবে পরিচিত (ওফাত ৮২৫ হি./১৪২২ খ্রি.) তাঁর লিখিত 'উমদাতুত্তালিব' গ্রন্থে নাজাফে হযরত আলী (আ.)-এর মাযারের সংগ্রহশালায় এক খণ্ড কুরআন ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া উবায়দুল্লাহ ইবনে আলীর মাযারে হযরত আলী (আ.) লিখিত এক খণ্ড কুরআন দেখেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। এ দু'টি কুরআনের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মিশরের কুরআনটির সাথে এর সংযোগ গবেষণার দাবি রাখে।

এমনকি আজও নাজাফে হযরত আলী (আ.)-এর মাযারের সংগ্রহশালায় এক খণ্ড কুরআন রয়েছে, কতক পণ্ডিত ব্যক্তি যাকে 'উমদাতুত্তালিব'-এ উল্লিখিত উক্ত কুরআনসমূহের অন্যতম বলে মনে করেন। সম্ভবত উবায়দুল্লাহ ইবনে আলীর মাজারের পাণ্ডুলিপিতে নাজাফের পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অংশ থেকে থাকবে।

সাইয়্যেদ আহমদ আল-হুসাইনী আল-আশকাভারী তাঁর লিখিত 'ফিহরিস্ত-ই-খাজানাতুর রাওজাতুল হায়দারিয়াহ' গ্রন্থে 'মাওসুআ'তুল আ'তাবাতিল মুকাদ্দাসাহ' (নাজাফ অধ্যায়)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ৭৫৫ হি./১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (আ.)-এর মাযারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, এতে হযরত আলী (আ.) কর্তৃক তিন খণ্ডে লিপিবদ্ধ কুরআনের পাণ্ডুলিপিসহ বহু দুর্লভ সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

(মাশহাদের) অস্তানেহ-এ-কুদসে রাজাভী-তে মওজুদ 'উমদাতুত্তালিব'-এর পাণ্ডুলিপির মার্জিনে নাসসাবাহর গ্রন্থাগারিক হুসাইন লিখিত কয়েকটি মূল্যবান টীকা-টিপ্পনী রয়েছে, এতে নাজাফের মুসহাফ সম্পর্কে একটি বিবরণ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট টীকায় বলা হয়েছে : সাইয়্যেদ নকীব (অর্থাৎ ইবনে ইনাবাহ আল-হাক্কানী নাসসাবাহ 'উমদাতুত্তালিব'-এর গ্রন্থকার) নাজাফে যে মুসহাফটি দেখেছেন এখনো তা নাজাফের সংগ্রহে বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুড়ে যায় এবং মাত্র এক খণ্ড অবশিষ্ট থাকে। এ খণ্ডটিও মার্জিনের টীকা-টিপ্পনী ছাড়াই ছিল, কেননা, মূল টেক্সটের অংশবিশেষসহ মার্জিনের টীকা-টিপ্পনীও আগুনে পুড়ে যায়।[৪৩]

ইমাম রেযা (আ.)-এর মাজারে রক্ষিত মুসহাফ

নাজাফে হযরত আলী (আ.)–এর মাযারস্থ সিন্দুকে রক্ষিত কুরআন ছাড়াও মাশহাদে হযরত ইমাম রেযা (আ.)-এর মাযারস্থ সংগ্রহশালায় কুরআনের আরো দু'টি পাণ্ডুলিপি রয়েছে যা হযরত আলী (আ.)-এর হস্তলিখিত বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে প্রথমটির ক্রমিক হচ্ছে ৬; এটি গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছে। এ মুসহাফটি কুফী হরফে হরিণচর্মের ওপরে লিখিত; এতে লেখা রয়েছে : كتبه علي ابن ابي طالب (অর্থাৎ এটি আলী ইবনে আবি তালিব কর্তৃক লিখিত)। এর প্রথম পৃষ্ঠায় শেখ বাহাই এর হস্তাক্ষরে তাঁর স্বাক্ষর ও ১০০৮ হিজরির তারিখ উল্লেখসহ সাফাভী বাদশা শাহ আব্বাসের উৎসর্গপত্র রয়েছে। এতে শেখ বাহাই লিখেছেন যে, এটি হযরত আলী (আ.) কর্তৃক লিখিত। ৬৮টি অংশবিশিষ্ট এ পাণ্ডুলিপিতে সূরা হূদ থেকে সূরা কাহ্ফ পর্যন্ত রয়েছে।[৪৪]

মাশ্হাদের দ্বিতীয় কুরআনটির ক্রমিক নং হচ্ছে ১। এর মার্জিনসমূহের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়েছে এবং মাঝখান থেকে কিছু আয়াত হারিয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, এর ৩৩ ও ৩৪তম অংশের মাঝামাঝি ৭৯টি আয়াত পাওয়া যাচ্ছে না। ৩৪১টি অংশে হরিণচর্মের ওপর এ কুরআন লিখিত এবং এতে সমগ্র কুরআন মজিদ শামিল রয়েছে। এটি শাহ আব্বাস কর্তৃক ১০০৯ হিজরিতে (১৬০০ খ্রি.) ইমাম রেযার মাযারে দান করা হয়। এখানে আমরা শেখ বাহাই এর হস্তাক্ষরে লিখিত উৎসর্গপত্রটি উল্লেখ করছি :

'ঈমানদারগণের অধিনায়ক, (রাসূলের) উত্তরাধিকারীদের প্রধান, আল্লাহর সিংহ অপারেজয় (বীর), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীদের নেতা, বহু বিস্ময়কর কর্মের নায়ক, যিনি স্বয়ং বহু অনন্য গুণের ধারক, আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবি তালিব (আলাইহিস সালাম)-এর পবিত্র হস্তাক্ষরে লিখিত এ কুরআন মজীদ ইসলামের আশ্রয়রূপ বাদশাহ–আল্লাহ তাআলা মানবশ্রেষ্ঠ (রাসূল সা.)-এর (রওযার) পবিত্র ধূলিকণার ছায়াপাত করুন তাঁর ওপর–দ্বাদশ সংখ্যক ইমামের সত্য-সঠিক মাজহাবের বিস্তারকারী এবং আমীরুল মুমিনীন হায়দার (আলী আ.)-এর একনিষ্ঠ খাদেম শাহ আব্বাস আলহোসাইনী আল মুসাভী আসসাফাভী বাহাদুর খান কর্তৃক–আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন এবং তাঁর কল্যাণকর্ম ও ন্যায়বিচারের দ্বারা বিশ্ববাসীকে অনুপ্রাণিত করুন; কুবল কর হে রাব্বুল আলামীন–আরশতুল্য মর্যাদার অধিকারী পবিত্র ও নূরানি রাযাভী (অর্থাৎ ইমাম রেযা আ. এর) রওযায়–এখানে যিনি ঘুমিয়ে আছেন তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ, সালাম ও অভিনন্দন–দান করা হলো। ইমাম রেযা আলাইহিস সালাম এর পবিত্র মাযারের ধূলিকণাতুল্য নাচিজ বান্দা খাদেম বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ কর্তৃক ১০০৯ সালে (হি.) লিখিত।'

তোপাকু সারায়ী সংগ্রহের মুসহাফ

তুরস্কে আরো দু'টি মুসহাফ রয়েছে যাকে হযরত আলীর মুসহাফ বলে মনে করা হয়। উভয় মুসহাফই আলআমানাহ লাইব্রেরিতে (যা বর্তমানে তোপাকু সারায়ী লাইব্রেরির অংশবিশেষ) রয়েছে। প্রথম মুসহাফটির (আলআমানাহ লাইব্রেরি) ক্রমিক নং হচ্ছে ২। এ থেকে ১৮টি মাইক্রোফিল্ম গ্রহণ করা হয় এবং কায়রোস্থ মা'হাদুল মাখতুতাতিল আরাবিয়্যাহ-তে এর মাইক্রোফিল্ম সংরক্ষিত রয়েছে। দ্বিতীয় মুসহাফটির ক্রমিক নং ২৯ এবং এ থেকে ১৪টি মাইক্রোফিল্ম নেয়া হয়েছে। এটি কায়রোর মা'হাদুল মাখতুতাতিল আরাবিয়্যাহ-তে রাখা হয়েছে।[৪৫-৪৬]

এখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা জরুরি বলে মনে হয় :

১. 'হযরত আলী (আ.)-এর মুসহাফ' নামে পরিচিত মুসহাফগুলোর লিপিতে দক্ষতা, সাযুজ্য ও সৌন্দর্য সুপরিস্ফুট, অথচ হিজরি প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আরবি লিপি (কুফী বর্ণমালা) এরূপ সমন্বয় ও সাযুজ্যের অধিকারী হয়নি।

এমতাবস্থায় এ মুসহাফগুলোকে কী করে হযরত আলী (আ.), যিনি ৪০ হিজরিতে (৬৬০ খ্রি.) শহীদ হন তাঁর লিখিত বলে মনে করা যেতে পারে?

২. যেহেতু হযরত আলী (আ.)-এর বিরাট কর্মব্যস্ততা ছিল সেহেতু কি করে এটা সম্ভব হতে পারে যে, তিনি কুরআন মজীদের কয়েকটি কপি করবেন?

৩. হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (আ.)-এর মুসহাফ নাযিলের ক্রম অনুযায়ী সংকলিত হয়েছিল এবং এতে বিভিন্ন সূরার বিষয়বস্তুও সংক্ষেপে উল্লিখিত ছিল, অথচ আলোচ্য মুসহাফগুলো প্রচলিত ক্রমেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সে যাই হোক, 'হযরত আলীর মুসহাফ' নামে পরিচিত মুসহাফগুলো তাঁর দ্বারা লিখিত হওয়া সম্পর্কে উত্থাপিত উপরিউক্ত সন্দেহসমূহের জবাবে বলা যেতে পারে :

হযরত আলী (আ.) যে নাযিলের ক্রম অনুযায়ী কুরআন সংকলন করেছিলেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই[৪৭], কিন্তু তিনি যে প্রচলিত বিন্যাস অনুযায়ীও কুরআন লিপিবদ্ধ করে থাকবেন এটা আদৌ অসম্ভব নয়।

হযরত আলীর বিভিন্ন ধরনের কর্মব্যস্ততা প্রসঙ্গে বলতে হয়, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মদীনায় তিনি ছিলেন অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব এবং মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে, বিশেষ করে বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু তিনি সরাসরিভাবে এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতেন না, অতএব, এটা প্রমাণ-অযোগ্য নয় যে, ঐ যুগে অবসর সময়ে তিনি কুরআনে মজীদের কপি করার কাজে আত্মনিয়োগ করে থাকবেন। বিশেষ করে কুরআন মজীদের মওজুদ কপিসমূহের সাথে আরো কিছু কপি যোগ হওয়ার মানে যখন কুরআনের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের সমার্থক ছিল সে পরিস্থিতিতে এ কাজে সক্ষম যেকোন ব্যক্তির জন্যই এতে আত্মনিয়োগ অপরিহার্য কর্তব্য ছিল।

আলোচ্য মুসহাফসমূহের লিপির সৌন্দর্য ও সাযুজ্য থেকে যে কুফী হরফের যাত্রাকালের লিপির সাথে তার অসামঞ্জস্যের ধারণা সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে বলতে হয় যে, ঐ যুগে হযরত আলী (আ.) ছিলেন লিপিশিল্পের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। হযরত আলী (আ.) তাঁর সচিব উবাইদুল্লাহ বিন আবি রাফি'কে লিপিশিল্প (ক্যালিগ্রাফি) শিক্ষা দিয়েছিলেন।[৪৮] বর্ণিত হয়েছে যে, একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

লিপিকার কুরআনের কপি করছিলেন, হযরত আলী (আ.) তাঁর লিপি পরীক্ষা করে তাঁর লিপিকুশলতার স্বীকৃতি দেন, যদিও তিনি খুবই ছোট ছোট অক্ষরে কুরআন কপিকরণের ব্যাপারে আপত্তি করেন।[৪৯]

ইবনে নাদিমের আলফিহরিস্ত-এ হযরত আলী (আ.)-এর সহচর খালিদ বিন আবিল হাইয়াজকে লিপিশিল্পের প্রশিক্ষক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫০] হযরত আলীর শাহাদাতের পরবর্তীকালে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের সচিব খালিদকে কিতাবের কপিকরণ এবং কবিতা ও হাদীস লেখার জন্য নিযুক্ত করেন। মসজিদুন্নববীর কিবলার দিকে তিনি স্বার্ণক্ষরে সূরা শামস থেকে শুরু করে কুরআনের শেষ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন।[৫১]

সে যাই হোক, উল্লিখিত মুসহাফসমূহ হযরত আলী (আ.) কর্তৃক কপিকৃত হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে স্বতন্ত্র গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথম যুগের কুরআনের লিপি

এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের যুগের কুরআনের কপিসমূহে কুফী হরফ ব্যবহৃত হয়েছিল। হীরা শহরের অধিবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত হরফেরই প্রকারভেদ কুফী হরফ হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর শাসনামলের শুরুর দিকেই ইরাক থেকে হিজাজে আসে এবং রাসূলের জীবদ্দশায়ই তাঁর সাহাবিগণ এ বর্ণমালা পড়তে-লিখতে শিখেন।

অনেকের মতে নাবাতীয় লিপি থেকে কুফী লিপির উদ্ভব ঘটেছে[৫২]। অন্যদের মতে সিরীয় লিপি থেকে এর উদ্ভব[৫৩]। কারণ, কুফী ও সিরীয় উভয় লিপিতেই শব্দের মাঝখানে আলিফ লেখা হয় না। যেমন : كتاب، رحمان ও اسماعيل শব্দ তিনটিকে উভয় লিপিতেই كتب ,رحمن ও اسمعيل রূপে লেখা হয়।

সে যাই হোক, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সময়ে হিজাজে কুফী হরফ ছাড়া আরো এক ধরনের লিখনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। একে নাবাতীয় হরফ বলা হতে পরে যা থেকে নাসখ্ হরফের উদ্ভব ঘটে। নাবাতীয় হরফ ছিল অত্যন্ত সহজ, এ কারণে আরবের লোক সবাই তা ব্যবহার করত।[৫৪]

মালেকুশ শূআ'রা বাহার তাঁর লিখিত 'সাব্‌ক শেনাসী' গ্রন্থে বলেন, বহু সংখ্যক হাদীস থেকে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে শুরু থেকেই ইসলামী লিপি ছিল নাবাতীয় লিপি যাকে নাস্‌খী ও দারিজ লিপি বলা হতো। আরবরা এ দু'টি লিপি নাবাতীয় লিপির শেষের দিককার সংস্করণ থেকে গ্রহণ করেছিল। সিরিয়ার প্রাচীন শহর হুরান থেকে নাবাতীয় লিপি হিজাজে আসে, কিন্তু ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআন সাধারণত কুফী হরফে লেখা হতো এবং কয়েক শতাব্দী যাবৎ এ ধারা অব্যাহত থাকে। এমনকি অনেকে দাবি করে থাকেন যে, যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর যুগে কুরআন কুফী হরফে লেখা হতো, সেহেতু অন্য কোন ধরনের হরফে কুরআন লিপিবদ্ধ করা অনুচিত, তাঁরা হরফের পরিবর্তনকে বিদআতের শামিল বলে গণ্য করেন।[৫৫]

দৃশ্যত মনে হচ্ছে, উপরোক্ত যুক্তির কোন সারবত্তা নেই। কেননা, ঐ যুগে লিখন শুধু এ লিপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে উপরোক্ত যুক্তিকে আরো সম্প্রসারিত করলে ঐ যুগে অনুপস্থিত কাগজ ও মুদ্রণ ব্যবস্থার ব্যবহারও অবৈধ হওয়া উচিত। ঘটনাক্রমে ওসমানী সাম্রাজ্যের পণ্ডিতগণ বহুদিন যাবৎ সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকায় কুরআন মুদ্রণ নিষিদ্ধ করে রাখেন।[৫৬] যদিও তৎকালে ওসমানী সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকায় মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু ছিল।[৫৭]

নাস্‌খ্‌ লিপি

ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নতির সাথে সাথে, বিশেষ করে আব্বাসী যুগে, আরবী লিপিরও চরম উন্নতি ঘটে। এ সময় লিপিশিল্পের (ক্যালিগ্রাফি) নিয়ম-কানুন প্রণীত হয়। সে যা-ই হোক, যেহেতু নাস্‌খ্‌ লিপি ছিল কুফী লিপির তুলনায় সহজতর, সেহেতু লিপিশিল্পী ও সাধারণ গণমানুষ উভয়ের দৃষ্টি নাস্‌খ্‌ লিপির প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়। পরে একদল লিপিশিল্পী নাস্‌খ্‌ লিপির সৌন্দর্য বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে মুকলাহ (২৭২-৩২৮ হি./৮৮৫-৯৩৯ খ্রি.) যিনি ইবনে মুকলাহ নামেই বেশি খ্যাত, তিনি ছিলেন এদের অন্যতম। অনেকে অবশ্য তাঁকে নাস্‌খ্‌ হরফের আবিষ্কর্তা বলে মনে করেন, তবে তা সত্য নয়। কেননা, অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই ন্যায় শিল্পকলা ও লিপি পর্যায়ক্রমে চরমোৎকর্ষের

দিকে এগিয়ে যায়, এ কারণে ইবনে মুকলাহর লিপিকে নাস্‌খ্‌ লিপির সূচনা বলে মনে করা যেতে পারে না। (সৌভাগ্যক্রমে তাঁর লিপি এবং পাণ্ডুলিপি হিসাবে পরিগণিত লেখাগুলো এখনো বিদ্যমান।)[৫৮]

(মাশহাদের) অস্তানেহ-এ-কুদ্‌স-এ রাজাভীতে সংরক্ষিত কুরআনে মজিদের মহামূল্য পাণ্ডুলিপিসমূহ এবং কায়রোর দারুল কুতুব, দামেশকের জহীরিয়াহ লাইব্রেরি, ফেজ-এর জাহাআ'তুল কারিয়িনের লাইব্রেরি ও ইস্তাম্বুলের তোপকাপু মিউজিয়ামে রক্ষিত কুরআনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি দেখতে পেয়েছি যে, এমনকি ইবনে মুকলাহর পূর্ববর্তী বিভিন্ন লেখা থেকেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলিতে এর দৃষ্টান্ত মিলবে :

১. আলখাত্তুল আ'রাবিয়্যেল ইসলামী– তুর্কি আ'তিয়াহ।

২. এ্যাতলাস-এ খাত্ত।

৩. ইনতিশারুল খাত্তিল আ'রাবী– অধ্যাপক আব্দুল ফাত্তাহ্‌ ই'বাদাহ।

৪. আলখাত্তাতুল বাগদাদী– ড. সুহাইল আনওয়ার।

৫. আলখাত্তুল আ'রাবী ওয়া আদাবুহু– মুহাম্মাদ তাহের বিন আবদুল কাদের আল-মাক্কী।

৬. মুসাওয়িরুল খাত্তিল আ'রাবী– নাজী জয়নুদ্দিন।[৫৯]

৭. আহওয়াল ওয়া আছারে খোশনেভিসন– মাহ্‌দী বায়ানী (নাস্‌খ্‌ বিভাগ)।

এসব সূত্রের অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা পাঠক-পাঠিকাদের সন্দেহ ভঞ্জনে সক্ষম হবে। অতএব, বোঝা যাচ্ছে, ইবনে মুকলাহ শুধু তাঁর দু'শ বছর পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছয় ধাঁচের লিপির (নাস্‌খ্‌ লিপিতে যা অন্তর্ভুক্ত) পূর্ণতা বিধান করেছেন মাত্র।[৬০] উল্লিখিত তথ্য সূত্রসমূহ এবং বিভিন্ন লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ইতিপূর্বে উল্লিখিত কুরআনের পাণ্ডুলিপিসমূহের অধ্যয়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদেরকে এ উপসংহারে উপনীত হতে বাধ্য করে যে, অনেকে দাবি করলেও নাবাতীয় লিপি থেকে নাস্‌খ্‌ লিপির উদ্ভব হয়নি; বরং কুফী লিপি থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে।

ইমাম, সাহাবী ও তাবেয়ীদের নামে প্রচলিত পাণ্ডুলিপিসমূহ

সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানে আমাদের হাতে সাহাবীদের যুগের বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। যদিও এসব পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে লেখক বলে উল্লিখিত ব্যক্তিরাই এসবের লেখক কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তথাপি এটা নিশ্চিত করে বলা চলে যে, এর মধ্যে সাহাবীদের হস্তলিখিত বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি রয়েছে। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকজন সাহাবী হিজরি প্রথম/খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন।[৬১]

ইমাম হাসান (আ.)-এর নামে প্রচলিত মুসহাফ

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর বিখ্যাত সাহাবিগণের নামে প্রচলিত মুসহাফসমূহের মধ্যে হযরত ওসমান ও হযরত আলী (আ.)-এর মুসহাফ বলে কথিত মুসহাফসমূহ নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। এছাড়া হযরত ইমাম হাসান মুজতাবার নামে প্রচলিত তিনটি মুসহাফ রয়েছে। এর মধ্যে একটি রয়েছে অস্তানেহ-এ কুদ্‌সে রাজাভীতে। এটির ক্রমিক নং হচ্ছে ১২। হরিণচর্মে ১২২ অংশে লিখিত এ মুসহাফে কুরআনে মজিদের ২৩ পারা থেকে ২৫ পারা পর্যন্ত শামিল রয়েছে।[৬২] এর ওপরে কুফী হরফে লেখা রয়েছে : 'আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব' এবং এতে ৪১ হিজরির তারিখ উল্লেখ রয়েছে। এর প্রথম অংশে শাহ্ আব্বাস সাফাভীর ওয়াক্‌ফনামা রয়েছে। এছাড়া এতে শেখ বাহাইর স্বাক্ষর রয়েছে, যিনি এ মুসহাফ ইমাম হাসান (আ.)-এর লিখিত বলে উল্লেখ করে লিখেছেন :

به امام همام سبط الرسول... ابی محمد الحسن علیه الصلوة و السلام

দ্বিতীয় মুসহাফটি নাজাফে হযরত আলীর মাজারের সিন্দুকে রক্ষিত মুসহাফ।[৬৩] আর হরিণ চর্মের ওপর দশ অংশে লিখিত তৃতীয় মুসহাফটি অত্র লেখক অধ্যাপক মাহমুদ ফাররুখ খোরাসানীর গ্রন্থাগারে দেখেছে। এটি এখনো তাঁর পরিবারের লোকদের হাতে আছে। এ মুসহাফটি সূরা নিসার ১২ নং আয়াত থেকে শুরু হয়েছে এবং সূরা তাওবার ৭ নং আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এতে হাসান বিন আব্বাস আসসাফাভী বাহাদুর খান এবং ইসমাইল আল-মুসাভী আল-হাসানী বাহাদুর খান-এর স্বাক্ষর রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, তাঁরা এ পাণ্ডুলিপিটি দেখেছেন।[৬৪]

এটা অসম্ভব নয় যে, এই তৃতীয় পাণ্ডুলিপিটি হয় অস্তানেহ-এ কুদসে রাজাভীস্থ কুরআনের অংশবিশেষ, নয়ত ইমাম আলীর মাজারস্থ কুরআনের অংশবিশেষ– যা

থেকে এ অংশটি আলাদা হয়ে থাকবে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, অধ্যাপক ফাররুখের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কুরআনে দশটির বেশি পাতা নেই। অতএব, এতে কুরআনে মজিদের সাত পারা অর্থাৎ চতুর্থ থেকে দশম পারা পর্যন্ত থাকতে পারে না। নিঃসন্দেহে এতে ইমাম আলী (আ.)-এর বলে অভিহিত কুরআনের কয়েকটি বিছিন্ন পাতা সংগৃহীত ও সংকলিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে রক্ষা না করেই একত্রে বাঁধাই করা হয়।

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মুসহাফ

কুফী হরফে হরিণ চর্মের ওপর লিখিত ৪১ অংশবিশিষ্ট এ কুরআনের ওপর লেখা রয়েছে :

كتبه حسين بن على অর্থাৎ 'হুসাইন বিন আলী কর্তৃক লিখিত'। এতে সূরা কাহ্‌ফ-এর ৭২ নং আয়াত থেকে শুরু করে সূরা ত্বা-হা এর শেষ আয়াত পর্যন্ত অর্থাৎ কুরআনের ১৬ নং পারা শামিল রয়েছে।[৬৫] পকেট সাইজের এ মুসহাফের প্রতি পৃষ্ঠায় সাতটি করে লাইন রয়েছে। এর ক্রমিক নং হচ্ছে ১৪।

আ'কাবাহ ইবনে আ'মীরের মুসহাফ

হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর অন্যতম সাহাবী আ'কাবাহ ইবনে আ'মীর কর্তৃক হিজরি ৫২/৬৭২ খ্রিস্টাব্দে এ মুসহাফ কুফী হরফে লিখিত হয়। তিনি দামেশকে বসবাস করতেন। তিনি ৪৪ হি./ ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান কর্তৃক মিশরের গভর্নর নিয়োজিত হন। তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।[৬৬] 'তাকরিবুত তাহজীব' গ্রন্থে তাঁর মিশরে অবস্থানকালের মেয়াদ তিন বছর বলে উল্লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি একজন ফকিহ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সুয়ূতী তাঁর 'হুসনুল মুহাদারা' গ্রন্থে লিখেছেন : 'সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক সুললিতকণ্ঠ ক্বারী ও ফকিহ।'[৬৭]

ইস্তাম্বুলের আল-আমানাহ গ্রন্থাগারে ক্রমিক নং ৪৩-এ কুরআনে মজিদের এ পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত রয়েছে। কায়রোর মা'হাদুল মাখতুতাতিল আ'রাবিয়্যাহ'তে এর একটি মাইক্রোফিল্ম রয়েছে যার ক্রমিক নং হচ্ছে ১০।[৬৮]

খাদিজ ইবনে মুআবিয়ার মুসহাফ

মাগরিবী হরফে লেখা আরেকটি মুসহাফ রয়েছে যা লিপিদ্ধ করেন খাদিজ ইবনে মুআবিয়া ইবনে সালামাহ আল-আনসারী। তিনি নিঃসন্দেহে সাহাবী রাফি' ইবনে খাদিজের পিতা নন, কেননা, রাফি'র দাদা (অর্থাৎ খাদিজের পিতা হচ্ছেন আদি এবং আমাদের আলোচ্য খাদিজের পিতার নাম মুআবিয়া)।[৬৯] খাদিজ ৪৭ হি./ ৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে কারাওয়ান শহরের আমীর আকাবাহ ইবনে নাফী আল-ফাহরীর জন্য এ মুসহাফ লিপিবদ্ধ করেন। ইস্তাম্বুলের আল-আমানাহ লাইব্রেরিতে এটি সংরক্ষিত রয়েছে। এর ক্রমিক নং হচ্ছে ৪৪। কায়রোর মা'হাদুল মাখতুতাতিল আরাবিয়্যাহ-তে ক্রমিক নং ৯-এ এর মাইক্রোফিল্ম রয়েছে।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর মুসহাফ

এ মুসহাফটি হযরত ইমাম সাজ্জাদ যায়নুল আবেদীন আলী ইবনে হোসাইন (আ.)-এর হস্তলিখিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অস্তানেহ-এ কুদসে রাজাভীতে ক্রমিক নং ১৫-এ সংরক্ষিত রয়েছে। ৩০ x ২০ সেন্টিমিটার আকারের হরিণ চর্মের ওপর লিখিত এ মুসহাফে সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত থেকে শুরু করে কুরআনে মজিদের শেষ পর্যন্ত রয়েছে। পরবর্তীকালে তা বাঁধাই করা হয় এবং এর মার্জিনে নকশার কাজ করা হয়।

ইমাম সাদেক (আ.)-এর মুসহাফ

হযরত ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইমাম সাদেক (আ.)-এর মুসহাফ নামে পরিচিত একটি পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের আল-আমানাহ লাইব্রেরিতে রয়েছে। এর ক্রমিক নং ৩৯। মা'হাদুল মাখতুতাতিল আ'রাবিয়্যাহ-তে এর মাইক্রোফিল্ম রয়েছে যার ক্রমিক নং হচ্ছে ১১।[৭০]

ইমাম মূসা ইবনে জা'ফর (আ.)-এর মুসহাফ

হযরত ইমাম মূসা ইবনে জাফরের মুসহাফ নামে পরিচিত পাণ্ডুলিপিতে সূরা বাকারার ২৬৫ নং আয়াত থেকে শুরু করে সূরা আলে ইমরানের ৮৪ নং আয়াত পর্যন্ত শামিল রয়েছে। মধ্যম আকারের বইয়ের সাইজের কাগজে লিখিত এ মুসহাফের প্রতি পৃষ্ঠায় ৬টি করে লাইন রয়েছে। এটি ইমাম রেযা (আ.)-এর মাযারে রক্ষিত আছে; এর ক্রমিক নং হচ্ছে ২০। শাহ আব্বাস সাফাভী কর্তৃক এটি ইমাম রেযার পবিত্র মাযারে দান করা হয়। এ কুরআন পার্চমেন্ট কাগজের ওপর লিখিত; প্রথমদিকে এর পৃষ্ঠাগুলো অনুরূপ রঙের এক ধরনের মোটা কাগজের ওপর লাগানো ছিল।

ইমাম রেযা (আ)-এর মুসহাফ

ইমাম রেযা (আ.)-এর মুসহাফ নামে পরিচিত পাণ্ডুলিপিটি অস্তানেহ-এ-কুদসে রাজাভীর গ্রন্থাগারে ক্রমিক নং ১৫৮৬-র অধীনে সংরক্ষিত আছে। এতে কুরআন মজিদের অংশবিশেষ রয়েছে।[৭১]

সাধারণ বইয়ের পাতার আকারের হরিণ চর্মের ওপর লিখিত এ পাণ্ডুলিপির প্রতি পাতায় ১৬টি লাইন রয়েছে। এর প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে :

قد تشرف بزيارة هذا المصحف الشريف المبارك

সাফাভী বাহাদুর খান এই পবিত্র ও বরকতময় মুসহাফ পরিদর্শন করেন।

এতে একটি ডিম্বাকৃতি সীল রয়েছে যাতে লেখা আছে :

جانشين حسن و حسين عليست

হাসান, হোসাইন ও আলীর উত্তরাধিকারী।

উপরিউক্ত মুসহাফসমূহ ছাড়াও কুফী হরফে লিখিত আরো বেশ কিছুসংখ্যক প্রাচীন মুসহাফ রয়েছে। এর মধ্যে কতগুলো মুসহাফে 'মদ্দ' এবং 'তাশদীদ' পর্যন্ত নেই; উল্লেখ্য, কুরআনে মজিদের লিখনে এ দু'টি চিহ্নের ব্যবহার বেশ দেরীতে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে প্রচলিত ই'রাব চিহ্নের পরিবর্তে এর অনেকগুলোতেই লাল কালির

বিন্দু রয়েছে; ই'রাব চিহ্ন প্রচলিত হবার পূর্বে স্বরচিহ্ন ব্যবহারের জন্য এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হতো। এসব মুসহাফের বেশির ভাগেই লিপিকারের নাম এবং লেখা সমাপ্তির তারিখ উল্লিখিত নেই। কারণ, এসব মুসহাফের বেশির ভাগ পাতাই বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগারে বিদ্যমান এই বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপির বেশির ভাগই হিজরি ২য়/খ্রিস্টীয় ৮ম এবং হিজরি ৪র্থ/খ্রিস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে লিখিত বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, ঐ সময় পর্যন্ত নাস্‌খ লিপি কুফী লিপির স্থান দখল করেনি। এ পাণ্ডুলিপিসমূহের এক সমৃদ্ধ ও মহামূল্য সমাহার ঘটেছে অস্তানেহ-এ কুদসে রাজাভী, ইরান বস্তান মিউজিয়াম, কোমের মাযার গ্রন্থাগারে, শিরাজের গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম, ইয়াজদের কিতাবখানায়ে ওয়াজিরী এবং অন্যান্য দেশের কতক গ্রন্থাগারে।

২য় থেকে ৪র্থ হিজরি শতকের কুফী লিপির নমুনা

অস্তানেহ্-এ-কুদসে রাজাভী-তে ক্রমিক নং ১১-এ নিবন্ধনকৃত মুসহাফটি হচ্ছে এ জাতীয় নমুনার অন্যতম। এত ১৩৩ খণ্ড হরিণ চর্মে রয়েছে।[৭২] এটি হিজরি ৩য়/খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম দিককার মুসহাফ। এ ধরনের আরেকটি মুসহাফ হচ্ছে হযরত ইমাম রেযা (আ.)-এর মাযারের গ্রন্থাগারে ক্রমিক নং ৪২-এর অধীনে সংরক্ষিত মুসহাফটি। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ মুসহাফ বলেই মনে হয়। শাহ আব্বাস এটি দান করেন। এ মুসহাফটি মাসুম ইমামগণের (আ.) লিখিত বলে উল্লেখ করা হয়। ইমাম রেযার মাযারের গ্রন্থাগারে ক্রমিক নং ৩১-এর অধীনেও একটি মুসহাফ রয়েছে। এতে ৫৪৫টি অংশ রয়েছে এবং এতে পুরো কুরআন শামিল রয়েছে বলে মনে হয়। এটি হিজরি ২য়/খ্রিস্টীয় ৮ম বা হিজরি ৩য়/খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া ধর্মীয় নগরী কোমের যাদুঘরে পার্চমেন্ট কাগজে লিখিত হিজরি ২য়/খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীর একটি মুসহাফ রয়েছে। অন্যদিকে ইমাম রেযার মাযারে ক্রমিক নং ৩৮-এর অধীনে হিজরি ৩য়/খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দীর এক খণ্ড কুরআন রয়েছে। তিউনিসের জাতীয় গ্রন্থাগারেও একটি কুরআন রয়েছে; হিজরি ৩য়/খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দীতে কায়রাওয়ানে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়।[৭৩]

সুপ্রাচীন মুসহাফসমূহ

ওপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মাসুম ইমামগণের নামে প্রচলিত মুসহাফসমূহ এবং আকাবাহ ইবনে আমির ও খাদিজ ইবনে মুআবিয়া লিখিত মুসহাফ ব্যতীত ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর অন্যান্য মুসহাফে লিপিকারের নাম এবং তা লিপিবদ্ধ করার তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।

অত্র লেখকের জানা মতে, কুরআন মজিদের প্রাপ্ত প্রাচীনতম মুসহাফ হচ্ছে কোমের যাদুঘরের ১৬২ নং পাণ্ডুলিপিটি। এতে ১৯৮ হিজরির তারিখ রয়েছে। এর লিপি হচ্ছে কুফী এবং পাণ্ডুলিপিটি ক্রাউন সাইজের।

আরেকটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হচ্ছে ইবনে মুকলাহ (২৭২-৩২৮ হি./ ৮৮৫-৯৩৯ খ্রি.) লিখিত মুসহাফ। এটি বর্তমানে হিরাত মিউজিয়ামে রয়েছে।[৭৪] অন্যদিকে ইবনুল বাওয়ার নামে খ্যাত আলী ইবনে হিলাল (মৃত্যু ৪২৩ হি./১০৩২ খ্রি.) লিখিত একটি মুসহাফ ডাবলিনের চেস্টার বিট্রি লাইব্রেরিতে রয়েছে; এটি হিজরি ৩৯১ সালে লিখিত।

অস্তানেহ-এ কুদসে রাজাভীর সংরক্ষণাগারে একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। হিজরি ৩৯৩ সালে আবুল কাশেম মনসুর ইবনে আবিল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে আবি মানসুর কাসির এটি দান করেন। আবুল কাসেমের জন্মস্থান ছিল হিরাত এবং তাঁর দাদা আহমদ ছিলেন কায়েনের লোক। তাঁর পিতা আবুল হুসাইন কাসির সামানী রাজ বংশের অধীনে মন্ত্রী ছিলেন, আর আল-আসমায়ী তাঁর প্রশংসা করেছেন। আবুল কাসেম মনসুর নিজেও একজন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ছিলেন সুলতান মাহমুদ গজনভীর মন্ত্রী। বায়হাকীর এক বর্ণনা অনুযায়ী সুলতান মাহমুদের সময় তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, সুলতান মাহমুদ তাঁর সঙ্গে সামরিক বিষয়ে পরামর্শ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি খোরাসানের প্রতিরক্ষা সচিব হন।[৭৫]

হিজরি ৪১০ সালে আলী ইবনে আহমদ আলওয়াররাক কর্তৃক লিখিত একটি অসম্পূর্ণ মুসহাফ বর্তমানে তিউনিসের মিউজিয়ামে রয়েছে; মুআজ ইবনে বাদিস আল-মাগরিবীর ধাত্রীমাতা হাদিনার জন্য এটি লেখা হয়।[৭৬]

নাজাফে হযরত আলী (আ.)-এর মাযারে একটি মুসহাফ রয়েছে; হিজরি ৪১৯ সালে রেই শহরে আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল মুহাদ্দিস কর্তৃক এটি লিখিত হয়।[৭৭] মাগরিবী হরফে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আরেকটি মুসহাফ রয়েছে ব্রিটেনের ম্যানচেস্টারের জন উইল্যান্ডার গ্রন্থাগারে ; এটি হিজরি ৪০০ সালে লেখা হয়।[৭৮]

অস্তানেহ-এ কুদসে রাজাভীতে আরেকটি মুসহাফ রয়েছে যা হিজরি ৪২১ সালে আবুল বারাকাত কর্তৃক আবু আলী হাওউলাহর মাধ্যমে ইমাম রেযা (আ.)-এর মাযারে দান করা হয়। এই আবু আলী হাওউলাহর সমসাময়িক ছা'লাবী তাঁর লিখিত 'তাতিম্মাতুল ইয়াতিমাহ' এবং বাখারজী তাঁর 'দুমিয়াতুল কাছর'-এ আবু আলীর জীবন কাহিনী লিখেছেন। এ থেকে জানা যায়, তিনি দায়লামী রাজত্বের একজন শিয়া মন্ত্রী ছিলেন এবং মাজদুদ্দৌলাহ দায়লামীর দিওয়ানে রাসায়েল হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। ৪২০ হি./১০২৯ খ্রিস্টাব্দে রেই দখল উপলক্ষে সুলতান মাহমুদ গজনভী আবু আলীকে পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাঁকে নিজের সাথে গজনী নিয়ে যান ও সচিব পদে নিয়োগ করেন। সুলতান মাহমুদের সময় তাঁকে পুনরায় দিওয়ানে রাসায়েল পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি ছিলেন দীর্ঘজীবী।[৭৯]

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটি অসমাপ্ত মুসহাফ রয়েছে।[৮০] হিজরি ৪২৭ সালে আবুল কাজেম সাঈদ বিন ইবরাহীম কর্তৃক নাস্‌খ্‌ হরফে এটি লেখা হয়। নাজী বিন আবদুল্লাহ এটিকে স্বর্ণমণ্ডিত করেন।

কায়রোস্থ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দু'টি অসমাপ্ত কুরআন রয়েছে, এর মধ্যে একটির শেষে লেখা সমাপ্ত করার তারিখ ৪৬৬ হিজরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮১]

নাজাফে হযরত আলী (আ.)-এর মাযারের সংগ্রহে আরেকটি স্বর্ণমণ্ডিত মুসহাফ রয়েছে যা যায়েদ বিন রেযা বিন যায়েদ আল-আলাভী কর্তৃক হিজরি ৪৩২ সালে লিপিবদ্ধ হয়।[৮২]

সম্প্রতি উসমান বিন হুসাইন আল-ওয়াররাক কর্তৃক ৪৬৬ হিজরি লিখিত ও স্বর্ণমণ্ডিত একটি চমৎকার ও মহামূল্য কুরআনের অংশবিশেষ ইমাম রেযা (আ.)-এর মাযারের পাশে খননকালে পাওয়া যায়। এর প্রতিটি অংশের প্রথম পাতা স্বর্ণমণ্ডিত রয়েছে। অস্তানেহ-এ কুদসে রাজাভীর কুরআন সংগ্রহ ভাণ্ডারে এটি রাখা হয়েছে।

এরপর থেকে প্রথম কয়েক শতাব্দীর আরো কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে যাতে লেখার তারিখ উল্লিখিত আছে। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর এবং তার পরবর্তী কালের তারিখযুক্ত বা তারিখবিহীন মুসহাফের সংখ্যা অনেক যার বর্ণনা দিতে গেলে আলাদা একটি গ্রন্থের প্রয়োজন। অত্র লেখকের জীবনকালে সম্ভব হলে মহান দয়াময় আল্লাহ্‌র সাহায্যের ওপর নির্ভর করে অপর একটি প্রবন্ধে এতদসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হবে, ইনশাআল্লাহ।

পাদটীকা :

১. হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর জীবনীকারগণের অধিকাংশই কম বেশি সকল ওহি-লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন। ড. রাময়ার তাঁর গ্রন্থ 'তারিখে কুরআন'-এ (পৃ. ৬৬) চল্লিশ জন ওহি-লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ড. সুবহি সালিহ তাঁর গ্রন্থ 'মাবাহিছুন ফি উলুমিল কুরআন' (পৃ. ৬৯)-এ ওহির লেখকের সংখ্যা সর্বোচ্চ চল্লিশ জন বলে উল্লেখ করেছেন। ড. হুজ্জাতী তাঁর গ্রন্থ 'তারিখে কুরআন'-এ (পৃ. ২০৩) উক্ত চল্লিশ জন ওহি-লেখকের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। (বিভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত ওহি-লেখকের সংখ্যা ও নামের জন্য দেখুন : রামিয়ার পূর্বোক্ত পৃ. ৩২৪)।

২. 'আল-ফিহরিস্ত'-এ এরূপই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু আসলে 'যায়িদ বিন সাবিত হবে। তেমনি সা'দ ইবনে উবাইদ হবে, সাঈদ নয়।

৩. ইবনে নাদিম, 'আল-ফিহরিস্ত', কায়রো, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াহ, পৃ. ৪৭।

৪. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবু ফাজায়েলিল কুরআন, বাবুল কুবরা মিন আসহাবিননাবী (সা.)।

৫. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবু ফাজায়েলিল কুরআন, বাবুল কুবরা মিন আসহাবিননাবী (সা.)।

৬. আল-জারাখশী, আল-বুরহানী ইসাল বাবিল হালাবী, কায়রো, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১।

৭. আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৪৫, ৪৬।

৮. আল-তামহিদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭।

৯. তারিখে ইয়াকুবী (ফারসি অনুবাদ), ২য় খণ্ড, ১৫।

১০. আল-ফিহরিস্ত, ৪৫।

১১. যেমন; কাবের মাসহাফে 'তা-সীন-সুলায়মান', 'আসহাবুল হিজর', 'আত্তাহারুহ' এবং 'আলিফ-লাম-মিম-তানযিল' নামসমূহ রয়েছে। তেমিন ইবনে মাসউদের মাসহাফে 'আল-হাওয়ারিউন' 'আল-কিয়ামাহ' এবং 'ইনশাক্কাহা' রয়েছে।

১২. সহীহ আল-বুখারী কিতাবু ফাজায়েলিল কুরআন, বাবু জামিয়ল কুরআন ইবনে আসির, কামিলুত্তাওয়ারিখ। এছাড়া অন্যান্য ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থেও একই বিষয় রয়েছে। আরো দেখুন ইবনে নাদিম, আল-ফিহরিস্ত, ফারসি অনুবাদ, পৃ. ৪১)।

১৩. তারিখে ইয়াকুবী, ফারসি অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫।

১৪. সহীহ আল-বুখারী, সুয়ূতী- 'আল-ইতকান', জারাখশী- 'আল-বুরহান', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০; তারিখে ইয়াকুবী, নাজাফ, ২য খণ্ড, পৃ. ১৪৭, সুবহি সালিহ- 'মাবাহিছুন ফি উলুমিল কুরআন, পৃ. ৭৮।

১৫. সহীহ আল-বুখারী এবং জারাখশীর 'আল-বুরহান', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

১৬. আল-মাসাহিফ, পৃ. ২৪।

১৭. মাবাহিছুন ফি উলুমিল কুরআন, ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৮২।

১৮. আল-মাসাহিফ-১৫; তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

১৯. ইয়াকুবীর মতে এর সংখ্যা হচ্ছে ৯ (২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭), সুয়ূতীর মতে (আল-ইতকান) ৫, ইবনে জাওজীর মতে ৮, সুবহি সালিহ তাঁর 'মাবাহিছুন ফি উলুমিল কুরআন'-এ (পৃ. ৮৪) আবু আমর আলদানির একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যাতে চার কপির কথা উল্লেখ আছে; এছাড়া তিনি আরো একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যাতে সাত কপির কথা বলা হয়েছে।

২০. মুজাজ উলমুল কুরআন, পৃ. ১৬৬।

২১. মু'জামুল বুলদান, বৈরুত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯।

২২. 'আততামহিদ, পৃ. ২৯৯ এবং সুবহি আসসালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

২৩. সাফারনামায়ে ইবনে বতুতাহ, ফারসি অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭।

২৪. খুতাতুশশাম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯।

২৫. রামিয়ার : তারিখে কুরআন, ১০৬।

২৬. রামিয়ার কর্তৃক গোল্ডজিহার-এর মাজহিবুত্তাফসিরিল ইসলামী থেকে উদ্ধৃত গোল্ডজিহার নাবুলুসীর 'কিতাবুল হাকিকাহ ওয়াল মাজাজ' থেকে লাইপজিগে এর পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

২৭. কাসানোভা থেকে রামিয়ার কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, ৪৬৬।

২৮. রামিয়ার : তারিখে কুরআন, ১০৬।

২৯. মাবাহিছুন ফি উলুমিল কুরআন, ৮৮।

৩০. প্রাগুক্ত; খুতাতুশশাম থেকে উদ্ধৃত; পঞ্চম খণ্ড, ২৭৯।

৩১. রওজাতুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭২।

৩২. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৪।

৩৩. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১১৩, তাফসীরুল কুম্মী, ৭৪৫; ইবনে নাদিম : আলফিহরিস্ত, ফারসি অনুবাদ।

৩৪. ইবনে নাদিম : আলফিহরিস্ত, ফারসি অনুবাদ, ৪৭।

৩৫. ইবনে জুজায়ী, আত্তাসহিল ফি উলুমিত তানযিল, বৈরুত, ৪, জারাকশী, আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন, ১ম খণ্ড, ২৪২, ২৩৬।

৩৬. মজলিসী-র 'বিহারুল আনওয়ার' থেকে 'আততামহিদ'-এ উদ্ধৃত।

৩৭. তিনি ৩৭৭ হিজরিতে আলফিহরিস্ত রচনা করেন।

৩৮. আলফিহরিস্ত, ফারসি অনুবাদ, ৪৭।

৩৯. রিয়াজুল উলামা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩ দ্রষ্টব্য।

৪০. আলমাকরিজী : আলমাওয়ায়িজু ওয়াল ইতিবার বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার, ২য় খণ্ড, ২৫২।

৪১. নমেহ-এ-অস্তানেহ-এ-কুদস সাময়িকীর ২২ ও ২৩ নং সংখ্যায় প্রকাশিত ইসলামী গ্রন্থাগার সংক্রান্ত অত্র লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪২. দেখুন ফিহরিস্ত : মাখতুতাতুর রাওজাতিল হায়দারিয়াহ, ২য় খণ্ড, ২৫২।

৪৩. শেষাংশ **তদীয়** বন্ধু হুজ্জাতুল ইসলাম হাজী সাইয়্যেদ মূসা জানজানী (শাব্বিরী) কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের ওপরে ভিত্তিশীল।

৪৪. রাহনামায়ে গাঞ্জিনেহ-এ কুরআন।

৪৫. মা'হাদুল মাখতুতাত-এর মাইক্রোফিল্মের তালিকা।

৪৬. সম্ভবত হযরত আলী (আ.)-এর মুসহাফ নামে পরিচিত একটি পাণ্ডুলিপি শিরাজ মিউজিয়ামে থেকে থাকবে, কিন্তু যেহেতু এ সম্পর্কে আমার নিকট নিশ্চিত তথ্য নেই সেহেতু তা উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম। হযরত আলীর মুসহাফ নামে পরিচিত আরো এক খণ্ড কুরআন ইয়েমেনের সানআ গ্রন্থাগারে রয়েছে; আমি আমার বন্ধু সাইয়্যেদ আহমদ আশকাভারী থেকে এ বিষয়ে জানতে পেরেছি।

৪৭. আততামহিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।

৪৮. নাহজুল বালাগায় হযরত আলী (আ.)-এর উক্তি; হিকাম তাঁর লিপিকার উবায়দুল্লাহ বিন আবি রাফি'কে বলেছেন বলে উল্লিখিত হয়েছে :

الق دواتك واطل جلفة قلمك و فرج بين السطور، قرمط بين الحروف: قال ذالك اجدر بصاحبه الخطز

৪৯. আমি স্মরণ করতে পারছি না কোথায় এ ঘটনাটি পড়েছি।

৫০. ইবনে নাদিম, আলফিহরিস্ত, ফারসি অনুবাদ, ৭১।

৫১. আততামহিদ, ১ম খণ্ড, ৩৫৫।

৫২. হিজরতের এক শতাব্দী পূর্বে নাবাতীয় ও সিরীয় বর্ণমালা থেমে কুফী ও নাস্‌খ লিপির উদ্ভব ঘটে। (দায়েরাতুল মাআ'রেফে মুসাহিব, ১ম খণ্ড, ৯০৩)।

৫৩. রামিয়ার, তারিখে কুরআন, ১১৭।

৫৪. প্রাগুক্ত।

৫৫. বায়হাকীর 'শূআ'বুল ঈমান' থেকে রামিয়ারের উদ্ধৃতি, তারিখে কুরআন, ১৪১।

৫৬. তারিখুত তিবাআ' ফিশ্‌শার্‌ক।

৫৭. ১১২১ হিজরির মুদ্রণে আরবি অক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়। (তারিখুত তিবাআ' ফিশ্‌শার্‌ক-২৫)

৫৮. যেমন আফগানিস্তানের হিরাত মিউজিয়ামের মুসহাফ। দেখুন, 'আলখাত্তুল আ'রাবিউল ইসলামী', ১৫৫ এবং 'খাত্তুল বাগদাদী', ১৬ দ্রষ্টব্য।

৫৯. এতে ২৪৯টি গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও রচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া খ্যাতনামা লিপি-শিল্পীদের ৭৫৭টি লিপির হুবহু কপি (ফ্যাসিমাইল) দ্বারা এটিকে সজ্জিত করা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৩৮৮ সালে বাগদাদে প্রকাশিত হয়।

৬০. দায়েরাতুল মাআ'রেফে মুসাহিব।

৬১. হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে সকলের শেষে যিনি মারা যান তিনি হচ্ছেন আবু তুফায়েল (আমির ইবনে ওয়াছিলাহ); তিনি ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর দীর্ঘজীবী সাহাবীদের সকলের নাম অত্র লেখকের 'ইলমুল হাদিস" গ্রন্থের ২৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৬২. রহনুমায়ে গাঞ্জিনেহ-এ কুরআন।

৬৩. ফিহরিস্ত– মাখতুতাতুর রাওজাতুল হায়দারিয়্যেহ, ১৫।

৬৪. 'হুসাইন ইবনে আব্বাস আল-হাসানী আস্‌-সাফাভী বাহাদুর খান এই বরমতময় ও মহান মুসহাফ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।' 'ইসমাইল আল-মুসাভী আল-হাসানী আস্‌-সাফাভী ২৭শে রজব, ৯... (সালের বাকি অংকগুলো বাঁধাই জনিত কারণে হারিয়ে গেছে)। এই বরকতময় ও মহান মুসহাফ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন।' জনাব ফররুখ লিখেছেন : 'আমি যা জানি তা হচ্ছে, এ কুরআনটি জুমআ ইমাম মরহুম মীর্জা হাসান আসকারীর গ্রন্থাগারে ছিল। আমার দাদা মীর্জা হুসাইন জাওয়াহের যিনি 'আ'ছি' নামে সুপরিচিত, মীর্জা আসকারীর উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে এটি ক্রয় করে নেন। অতঃপর আমার পিতা সাইয়্যেদ আহমদ জাওয়াহেরী, যিনি 'দানা' নামে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর মাধ্যমে উত্তরাধিকার হিসাবে তা আমার নিকট পৌঁছে। বর্তমানে এটি আমার নিকট রয়েছে। হুজ্জাতুল ইসলাম আল হাজ মীর্জা আসকারী, যিনি 'জুমআ ইমাম' নামে খ্যাত, তিনি ছিলেন খ্যাতনামা মুজতাহিদ ও কবি আল হাজ সাইয়্যেদ হাবীবের চাচা এবং 'শহীদে সালামে' নামে খ্যাত সাইয়্যেদ মাহদীর পুত্র আল হাজ মীর্জা হেদায়াতুল্লাহর সন্তান। খোরাসানের শহীদী বংশ তাঁরই বংশধর। 'শহীদে সালেস' নামে খ্যাত সাইয়্যেদ মাহদী ছিলেন শাহ নিয়ামতুল্লাহ ওয়ালীর বংশধর। তিনি ইসফাহান থেকে খোরাসানে আগমন করেন এবং শহীদ হন।

৬৫. রাহনুময়ে গাঞ্জিনেহ-এ কুরআন, ৮-১৩।

৬৬. আন্নাবাভী, তাহজীবুল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

৬৭. হুসনুল মুহাজারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০।

৬৮. আল-আমানাহ লাইব্রেরি বর্তমানে তোপকাপু সারাই লাইব্রেরিতে একীভূত এবং এর একটি বড় অংশ, এটিকে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করা হয়।

৬৯. ইবনে হাজার আসকালানী– তাকরীবুত তাহজীব।

৭০. অস্তানেহ-এ কুদসে রাজাভী যদি এই পাণ্ডুলিপিটি এবং বিদেশী গ্রন্থাগারসমূহে রক্ষিত অন্যান্য পাণ্ডুলিপির ফিল্ম বা প্রথম পৃষ্ঠার ফটো সংগ্রহ করে এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর পরিবারের উত্তরাধিকার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিদের ও সাধারণ মানুষের জন্য প্রদর্শন করে তাহলে খুবই ভালো হয়।

৭১. এতে আছে সূরা নূর, কাছাছ, আনকাবুত, রুম, লুকমান, সাজদাহ, আহযাব, মুমিন, ফুসসিলাত, জাসিয়াহ, আহকাফ, ওয়াকিয়াহ ও হাদীদ।

৭২. যেহেতু হরিণের চামড়া হচ্ছে সাদা, নাজুক ও কম চর্বিযুক্ত, সেহেতু এর দ্বারাই পার্চমেন্ট তৈরি হতো এবং এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহকে 'হরিণ চর্ম' বলে অভিহিত করা হতো। যদিও বাহ্যত সহজলভ্য মেষ চর্মেও একই গুণাবলি রয়েছে। 'জাফর' বা 'জাফর-ই আবিয়াদ'-ও মেষ চর্মের পার্চমেন্ট যাতে ঐশী ইলম লিপিবদ্ধ করা হতো এবং তা আহলে বাইতের তত্ত্বাবধানে রাখা হতো। 'মাজমাউল বাহরাইন'-এর 'জাফর' শিরোনাম দেখুন।

৭৩. ড. হুজ্জাতীর 'তারিখে কুরআন'-এ এর প্রথম পৃষ্ঠার ছবি দেখা যেতে পারে; ক্রমিক নং ৬০।

৭৪. দেখুন, 'আল-খাত্তুল আ'রাবিয়্যিল ইসলামী, তুর্কি আ'তিয়্যাহ, পৃ. ১৫৫। তাছাড়া দেখুন আত-তামহীদ, পৃ. ৩৫৮।

৭৫. রহনুমায়ে গাঞ্জিনেহ-এ কুরআন, লোগাতনমেহ-এ-দেহখোদা-এ উদ্ধৃত।

৭৬. ড. হুজ্জাতী, তারিখে কুরআন, চিত্র নং ৭৯।

৭৭. ফিহরিস্ত মাখতুতাতুর রাওজাতুল হায়দারিয়াহ, পৃ. ১৪।

৭৮. দেখুন, মুস্তাশরিকীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬।

৭৯. রহনুমায়ে গাঞ্জিনেহ-এ-কুরআন; 'রাহাতুছ ছুদুর', 'আন-নাক্দ' এবং 'তারিখে বায়হাকী'- পার্শ্বটীকা থেকে উদ্ধৃত।

৮০. ড. হুজ্জাতী, তারিখে কুরআন, চিত্র নং ৮০।

৮১. অত্র লেখকের 'ইয়দ্দশত্হয়ে সাফারে মেছ্র'।

৮২. ফিহরিস্ত মাখতুতাতুর রাওজাতিল হায়দারিয়্যাহ।

(ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত নিউজলেটারের সৌজন্যে)

কুরআন ও জীবনের প্রকৃতি

শহীদ আয়তুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহহারী

পবিত্র কুরআনে জীবনের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক আয়াতে সৃষ্টিকুলে প্রাণের উন্মেষ, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়, জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি, জীবনের প্রতিক্রিয়া, যেমন বুদ্ধিমত্তা, বিবেক, অনুভূতি, শ্রুতি, দর্শন, নির্দেশিকা, অনুপ্রেরণা, সহজাত প্রবৃত্তি এবং এ ধরনের আরো অনেক খোদায়ী জ্ঞান ও পরিকল্পনার নিদর্শনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর প্রতিটিই এক একটি চিন্তাকর্ষক বিষয়। তবে এখানে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা আমাদের নেই।

পবিত্র কুরআনে জীবন প্রসঙ্গে আলোচনার একটি মূলভাব হলো জীবন হচ্ছে আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাআলাই জীবন দান করেন এবং তা নিয়ে যান। এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন একথাই বুঝাতে চেয়েছে যে, জীবন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিয়ন্ত্রণে নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জীবন দানও করতে পারে না কিংবা নিয়ে যেতেও পারে না। আমরা এ ব্যাপারে এখানে আলোচনা করতে চাই।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি উক্তির উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। সেখানে তিনি তদানীন্তন স্বৈরাচারী শাসককে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।' (সূরা বাকারা : ২৫৮)

সূরা মূলকে আল্লাহর পরিচয় বিবৃত করা হয়েছে এই ভাষায় : 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন।' (সূরা মূলক : ২)

কুরআন পাকে এমন বহু আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র জীবনদাতা এবং মৃত্যুর মালিক রূপে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এই জীবন দান ও জীবন নিয়ে নেয়া– এই দুটি বিষয় সরাসরি আল্লাহর উপর আরোপিত ও তাঁর বিশেষ অধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া কুরআন পাকের কিছু আয়াতের মধ্যে

কয়েকজন নবীর কথা বলা হয়েছে যাঁরা মৃতদেহের মধ্যে জীবন দান করতেন। কুরআন পাকে এ ব্যাপারে সতর্কভাবে এ ধরনের বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এ কথা বুঝা যায় যে, এ ধরনের ঘটনা একমাত্র আল্লাহর অনুমতিক্রমেই ঘটেছে। উদাহরণ হিসাবে এখানে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। '...এবং তাঁকে বনি ইসরাইলের জন্য রাসূল করবেন। সে বলবে, আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কাদা দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব, অতঃপর তাতে আমি ফুৎকার দিব, ফলে আল্লাহর হুকুমে ওটা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করব।' (সূরা আলে ইমরান : ৪৯)

মোটের উপর, আস্তিক বা আল্লাহতে বিশ্বাসী ও বস্তুবাদী ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যসমূহের মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে, আস্তিক ব্যক্তি জীবনের উৎপত্তি ও উৎস এবং এর স্রষ্টাকে অতীন্দ্রিয় বিষয় হিসাবে গণ্য করে, অন্যদিকে বস্তুবাদী ব্যক্তি বস্তুকেই জীবনের সৃষ্টিকারী বলে বিবেচনা করে থাকে। তবে এ ব্যাপারে যে বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হলো আল্লাহ তাআলা জীবনের স্রষ্টা- এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের যুক্তি এবং আস্তিক ব্যক্তিদের সাধারণ প্রচলিত যুক্তির মধ্যে অতিসূক্ষ্ম, তবে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য মহাগ্রন্থের আরেকটি অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ। আমাদের বিশ্বাস, আস্তিক চিন্তাবিদরা যদি এই যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হন তা হলে তাঁরা বস্তুবাদীদের হয়রানি থেকে নিজেদের চিরদিনের জন্য মুক্ত করতে পারবেন এবং সেইসাথে ঐসব হতভাগ্যকেও তাদের কল্পনা-বিলাস ও ভ্রান্তির কবল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন। সাধারণভাবে, যখন আস্তিক চিন্তাবিদরা আল্লাহ এবং খোদায়ী ইচ্ছার সঙ্গে জীবনের বিষয়টিকে সম্পর্কযুক্ত করতে চান তখন তাঁরা পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব এবং প্রথম প্রাণের আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে প্রশ্নের সমস্যার কথা তুলে আনেন। চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক আলামত বা প্রমাণাদি নির্দেশ করে যে, ভূপৃষ্ঠে জীবনের শুরু হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট সময় থেকে, জীবজন্তু ও উদ্ভিদসহ বিভিন্ন ধরনের সৃষ্ট জীবের কোনটারই অস্তিত্ব অনন্তকাল থেকে সব সময়ই ছিল না। এর কারণ হচ্ছে পৃথিবীর নিজের বয়সটাই সীমিত। অধিকন্তু কয়েক লক্ষ বছর ভূপৃষ্ঠ কোন জীবের পক্ষে প্রাণ ধারণের উপযোগী ছিল না বলে অনুমান করা হয়।

আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি থেকে সব সময় সেই প্রজাতিই জন্ম নেয়। যেমন গম থেকে গম, বার্লি থেকে বার্লি, ঘোড়া থেকে ঘোড়া, উট থেকে উট এবং মানুষ থেকে মানুষই জন্ম নেয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, শুধু এক গাদা ধূলি থেকে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের জন্মলাভের কোন রীতি প্রকৃতিতে নেই। সব সময়ই একটি জীবন্ত প্রাণীর উৎস আরেকটি জীবন্ত প্রাণী- যা বীজ বা ভ্রুণ আকারে অন্যটা থেকে ভিন্ন এবং উপযোগী অবস্থান বা পরিবেশে বিকাশ লাভ করে।

আদিতে জীবনের শুরু কিভাবে হয়েছিল এবং কি পন্থায় হয়েছিল? একটি নির্দিষ্ট প্রাণী থেকেই কি এই অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে কিংবা একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিই কি সকল প্রাণীর জন্মের উৎস? এটাই যদি সত্য হয় তাহলে প্রথম প্রাণীটির আবির্ভাব কিভাবে ঘটেছিল, কারণ, কোন বীজ বা ভ্রুণ ছাড়া কোন প্রাণীর জন্মলাভের বিষয়কে প্রকৃতি অনুমোদন করে বলে মনে হয় না। সুতরাং (তাঁরা উল্লেখ করেন) আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে। অন্য কথায় বলা যায়, একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এবং আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যলোক থেকে প্রথম প্রাণী সৃষ্টির মাধ্যমে এর আবির্ভাব ঘটান।

কিংবা সম্ভবত সকল প্রজাতির প্রাণী একটি একক উৎস থেকেই জন্ম নিয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির পরিবারের সদস্য? এই অনুমানের ভিত্তিতেও আমাদের একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি যদি আমরা ধরে নেই যে, সকল প্রজাতি একটি একক এককোষবিশিষ্ট প্রাণী থেকেই উদ্ভূত হয়েছে তা হলেও সেই একই প্রশ্ন দেখা দেয়? কিভাবে সেই প্রথম প্রাণীটির আবির্ভাব ঘটেছিল। এটা কি সেই একই ধরনের প্রশ্ন নয় যে, বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, অপর কোন প্রাণী ছাড়া জীবন্ত কোন প্রাণীর উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নয়। নিয়ম ও অলৌকিক ঘটনার ক্ষেত্রে কি কোন ব্যতিক্রম আছে যেখানে খোদায়ী ইচ্ছা তাৎক্ষণিকভাবে একটি জীবন্ত কোষ তৈরিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

এখানে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণকারীরা কয়েকটি অনুমানের দিকে চালিত হতে বাধ্য যা তাদের নিজেদের জন্যই অকল্পনীয়। অন্যদিকে আস্তিকরা একজন সৃষ্টিকর্তার বিদ্যমানতার প্রমাণ হিসাবেই বিবেচনা করে এবং একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রথম প্রাণী সৃষ্টি করেছে বলে মনে করে এবং খোদায়ী ইচ্ছার কারণেই এই প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই রকম এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন

একজন আস্তিক। তিনি প্রাণীর প্রজাতিসমূহের শাখা-প্রশাখা উদ্ভূত হওয়ার সমস্যার সমাধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, অন্য কোন প্রাণীর জন্মদান ছাড়াই ভূপৃষ্ঠে এক বা একাধিক প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেন, ঐশ্বরিক ফুঁয়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। ক্রিসি মরিসন তাঁর 'মানুষ সৃষ্টির গোপন কথা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আজ এটা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ হয়েছে যে, কোন পরিবেশই, তা প্রাণীর অনুকূল বা প্রতিকূল যা-ই থাক না কেন, প্রাণী সৃষ্টি করতে পারে না। একইভাবে, কোন রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষ বা সমন্বয়ে কোন প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে না। জীবন সৃষ্টির সমস্যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এখনো একটি অমীমাংসতি বিষয়ই রয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, বস্তুর কিছু সংখ্যক অতিসূক্ষ্ম অণু যদি অনেকগুলো অণুর সঙ্গে মিলিত হয় তা হলে তাদের সমান্তরাল রেখায় বিভ্রাট ঘটবে এবং তাদের কিছু অংশের বের হয়ে যাওয়া বা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে জীবন লাভের কল্পনা করা হয়। এ পর্যন্ত কোন মানুষ রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন দান করতে পেরেছে এমন দাবি করতে পারবে না।'

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্রিসি মরিসন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, জীবনের উৎপত্তি ও শুরুর মাঝে একজন সৃষ্টিকর্তার হাত রয়েছে। কারণ, এটি বস্তুগত বা প্রাকৃতিক কার্যকারণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বলা যায়, বিজ্ঞান সৃষ্টি করার মতো গভীর চিন্তা ও ক্ষমতাসম্পন্ন অসাধারণ দক্ষ একটি বুদ্ধিমান প্রাণীর আবির্ভাবের ফলে ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। ক্রিসি মরিসন বলেন, 'বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল জীব হিসাবে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের ঘটনা এতই গভীর যে, তাকে বস্তুগত পরিবর্তনের ফল হিসাবেই বিবেচনা করা যায় যাতে একজন স্রষ্টার কোন হাত নেই।' এই হচ্ছে জীবন ও খোদায়ী ইচ্ছার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে এই গ্রুপের চিন্তাবিদদের চিন্তা ও যুক্তিতর্কের প্রণালীর একটি নমুনা। উদ্ধৃত বক্তব্যের সাথে এই গ্রুপের অন্যদের বক্তব্যের খুব একটা পার্থক্য নেই এবং কম বেশি প্রায় একই রকমের। সুতরাং এখানে তার উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

আমরা জানি, মানুষ সকল প্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখনো পর্যন্ত জীবন্ত প্রাণীর কোন উপাদান বা সারাংশ তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায, যে সজীব গম বপন করলে তা থেকে চারা গজায় ও বিকাশ লাভ ঘটে, মানুষ রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে সে রকম গুণসম্পন্ন কৃত্রিম গম তৈরি করতে অক্ষম। যে

কোন প্রাণী বা মানুষের এমন ক্ষমতাসম্পন্ন কৃত্রিম শুক্র তৈরি করতেও সক্ষম নয় যা থেকে কোন প্রাণী বা মানুষের জন্ম হতে পারে। এতদসত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হননি এবং তাঁদের জন্য এখনো এটি চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়নি যে, তাঁরা ভবিষ্যতে এটি করতে সক্ষম হবেন কিংবা এই বিষয়টি মানুষের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষমতার আওতার বাইরে।

জীবনের উৎপত্তি ও শুরুর ব্যাপারে আলোচনার সময়ে আস্তিকরা কেন খোদায়ী ইচ্ছার সঙ্গে জীবনের সপৃক্ততার কথা উল্লেখ করে তার কারণ আমাদের উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন এবং আমাদের এ-ও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন কেন পবিত্র কুরআন তাওহীদের গুরুত্বকে বোঝানোর জন্য এই পথ গ্রহণ করে না বরং প্রাণ ও জৈবিক বিকাশের বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রত্যক্ষ ইচ্ছার ফল বলে বিবেচনা করে জীবনের শুরু ও এর বিকাশের মধ্যে কোনরূপ ভেদ রেখা না টেনেই।

প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, পবিত্র কুরআন এবং অন্য সকল দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তির মধ্যে অধিকতর মৌলিক পার্থক্য থেকেই এই মতভেদের উৎপত্তি। এর কারণ হচ্ছে, একদল আস্তিক তাদের জ্ঞানের প্রেক্ষিতে আল্লাহকে সাধারণত ইতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এ জন্য তারা তাদের জ্ঞানের অতীত কোন বিষয় মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে সেখানে তারা আল্লাহকে নিয়ে আসে বা আল্লাহর উর নির্ভর করে। তাদের জ্ঞানাতীত বিষয়ের মধ্যে তারা সর্বদাই আল্লাহকে খুঁজে। যখন কোন ক্ষেত্রে তারা তাদের জ্ঞানাতীত কোন প্রাকৃতিক কারণের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাৎক্ষণিকভাবে দাবি করে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই এটার উদ্ভব হয়েছে। এভাবে তাদের কাছে প্রাকৃতিক কার্যকরণ জানা নেই এ রকম বিষয়ের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই তারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বেশি করে দিতে থাকে।

অন্যদিকে জ্ঞানের আয়ত্তাধীন ও ব্যাখ্যাযোগ্য বিষয়ের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণও তাদের কাছে তত কমতে থাকে। মুজতাহিদ আলেম ও তাওহীদের অনুসরণকারীদের কাছে অতিপ্রাকৃতিক বিষয় হচ্ছে অজানা রহস্যের এক ভাণ্ডার। যখনই তারা কোন বিষয়ে বুঝতে বা অবগত হতে অক্ষম হয় এবং তার কারণ উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয় তখনই তারা তাৎক্ষণিকভাবে সেটাকে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে। তারা এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের ভূমিকা নিহিত দেখতে পায়, তাদের কাছে এ রকমই মনে হয়, যা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম এবং স্বাভাবিক

নিয়মের লঙ্ঘন। তারা যখন সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কারণ খুঁজে পায় না তখন তারা মনের অজান্তে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের বিকল্প হিসাবে এটাকে ধরে নেয়। এটা ঘটার কারণ, প্রথমত অতিপ্রাকৃত জগতের একটি নিজস্ব নিয়ম ও পদ্ধতি আছে; দ্বিতীয়ত তারা এটা ভুলে যায় যে, বস্তুগত বা প্রাকৃতিক কারণে যদি একটি ঘটনা ঘটে তা হলে তা বস্তু ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে অনুযায়ী সেটি অবশ্যই বস্তুগত বা প্রাকৃতিক কারণের বিকল্প হবে। সেটি অতিপ্রাকৃত বিষয়ের বিকল্প হতে পারে না। প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃত এই দু'টি বিষয়ের অস্তিত্বের স্তর আলাদা। একটি প্রাকৃতিক কারণ যেমন অতিপ্রাকৃতের বিকল্প হতে পারে না ঠিক তেমিন অতিপ্রাকৃতও প্রাকৃতিক কারণের বিকল্প নয়।

আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কুরআন কখনো এমন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না যে পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক আইন ও ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে এটা নির্ভর করে এমন সব প্রাথমিক ও প্রাকৃতিক কারণের উপর যা জনগণের জানা এবং এ ব্যাপারে এমন সব উদ্ধৃতি দেয় যাতে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ এটি নিজেই হয়ে দাঁড়ায়।

ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই বিষয়টিও জীবনের উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যার মতো সারাবিশ্বে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ফলে উপরে উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিসহ আস্তিক্যবাদী এই দলটি বলে থাকে যে, জীবন সৃষ্টির বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে এবং এ প্রশ্নেও তাদের মত হচ্ছে, মানুষ যত চেষ্টাই করুক তা বৃথা হতে বাধ্য। জীবন সৃষ্টির বিষয়টি যেহেতু সম্পূর্ণরূপে খোদায়ী ইচ্ছার অধীন সেহেতু জীবনের উপর মানুষর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পন্থায়ও সে কোন জীবন সৃষ্টি করতে পারে না। যেসব নবী-রাসূল (আ.) মৃতকে জীবিত করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেউ যদি এ রকম কাজ সম্পাদন করতে চায় তাহলে তার মনে হবে এই যে, এই ধরনের ব্যক্তিকে নবী-রাসূলের পদমর্যাদায় সামিল হতে হবে এবং অলৌকিক কার্য সম্পাদন করতে হবে। নবী-রাসূল ও আউলিয়াগণ ছাড়া আল্লাহ তাআলা অন্য কারো হাত দিয়ে কোন অলৌকিক কার্য সম্পাদন করান না।

আস্তিক্যবাদী দলটি এ ব্যাপারে তাদের দাবির প্রমাণ হিসাবে মানুষের বর্তমান অক্ষমতাকেই বিবেচনা করে। মানুষ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে

প্রাকৃতিক গমের মতোই কৃত্রিম গম তৈরি করতে সক্ষম হলেও সে গমে জীবনের যে বৈশিষ্ট্য সেটা থাকে না অর্থাৎ এ গম থেকে কোনমতেই চারা গজাবে না। এটা প্রত্যক্ষ করার পর আস্তিক্যবাদী দলটি উল্লেখ করে যে, এটা সম্ভব হয় না এই কারণে যে, জীবনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে খোদায়ী ইচ্ছার উপর এবং জীবন সৃষ্টির জন্য তাঁর অনুমতি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূল ছাড়া এই অনুমতি অন্য কাউকে দেন না। আমরা বলি, মহাগ্রন্থ কুরআন সুস্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে, জীবন আল্লাহর হাতে এবং তিনি ছাড়া জীবন সৃষ্টিতে অন্য কারো ভূমিকার কথা পবিত্র কুরআন নাকচ করে দিয়েছে। তবে এ বিষয়ের সমর্থনে পবিত্র কুরআন মানবজাতির উৎপত্তি কিংবা জীবন শুরুর বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করেনি। অন্যদিকে এটা বর্তমান অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবস্থাকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে এবং বর্তমান চলমান জীবন পদ্ধতিকে সৃষ্টি, মানানসই ও বিকাশের পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করে। তবে এটা জীবনের সম্পর্ক সম্বন্ধে আল্লাহর সৃষ্টি করার ক্ষমতা যখন বর্ণনা করার ইচ্ছা করে তখন প্রথম দিনের কথা উল্লেখ করে না। এ প্রসঙ্গে এটা প্রথম এবং পরবর্তী দিনগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। বরং এটা সৃষ্টির পরিবর্তনের মতোই বর্তমান নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে। উদাহরণ হিসাবে সূরা মুমিনুন থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে : 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে, অতঃপর আমি ওটাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা; অবশেষে ওটাকে গড়ে তুলি অনন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! (সূরা মুমিনুন : ১২-১৪)

এই আয়াতসমূহে ভ্রূণ বা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত রূপান্তর ও পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে এবং এই বিকাশকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক বিকাশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা নূহতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের কি হয়েছে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইছ না? অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।' (সূরা নূহ : ১৩-১৪)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে : 'তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা যুমার : ৬)

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে : 'তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।' (সূরা বাকারা : ২৮)

এই প্রসঙ্গে এমন আরো অনেক আয়াত রয়েছে এবং এসবগুলোতেই সৃষ্টির পদ্ধতির ক্ষেত্রে বর্তমান চলমান শৃঙ্খলার বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। মাটির নিচে শস্যকণা ও বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম, চারা বা লতাগুল্মের বেড়ে ওঠা, বসন্ত কালে গাছপালার সবুজ রং ধারণ- এসবই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার চির নতুন ও শাশ্বত সৃষ্টি ক্ষমতার অংশবিশেষ। পবিত্র কুরআনের কোন স্থানেই ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত প্রথম মানুষ বা প্রথম জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর সৃজনশীলতা ও ইচ্ছার ভূমিকার কথা বিবেচনা করা হয় না কিংবা ঐ প্রাণী বা শস্য আল্লাহর সৃষ্টি এবং খোদায়ী ইচ্ছার ফল শুধু এই হিসাবেই বিবেচনা করা হয়।

পবিত্র কুরআন হযরত আদম (আঃ)- কে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করেছে তবে তা একত্ববাদের বিষয় নিশ্চিত করা কিংবা আদম (আঃ) প্রথম মানুষ এই যুক্তি দাঁড় করানোর জন্য নয়, বরং সৃষ্টিকর্মের ঘটনা ঘটতে পারে এবং মহান জীবন সৃষ্টি করতে আল্লাহর হাত আস্তিনের মধ্যে থেকে বের হতে পারে এটা প্রমাণ করাই এর উদ্দেশ্য। আল্লাহর হাত কখনো আস্তিনের মধ্য আবদ্ধ থাকে না।

এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণের মত একটা অদ্ভুত বিষয় আছে। কুরআন পাক অনেক নৈতিক ও শিক্ষামূলক বিষয় অবগত করানোর জন্য হযরত আদম (আঃ)-এর গল্পের অবতারণা করেছ। এর মধ্যে আছে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব লাভের ব্যাপারে মানুষের যোগ্যতা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার পর্যাপ্ত দক্ষতা, তার জ্ঞানের সামনে আল্লাহর ফেরেশতাদের নতি স্বীকার, ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, অর্জনের ক্ষমতা, লোভের পরিণাম, অহংকারে অপকারিতা, মানুষের অস্বীকৃতির ফলে সৃষ্ট পাপের প্রতিক্রিয়া বেহেশত থেকে বহিষ্কার, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্রে অনুশোচনার ভূমিকা ও আল্লাহর কাছে তার প্রত্যাবর্তন, শয়তানের কু-মন্ত্রণায় বিপথগামী হওয়ার বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ারী এবং এ ধরনের আরো অনেক বিষয়। কিন্তু আদম (আঃ) সৃষ্টির বিষয়টি একত্ববাদ ও ধর্মের বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ ও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি হিসাবে কখনো সংযুক্ত করা হয়নি। আদম (আঃ) সম্পর্কে গল্পের অবতারণা করার পিছনে

উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক ও শিক্ষামূলক উপদেশ দান। তওহীদের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে এটাকে দাঁড় করানো উদ্দেশ্য ছিল না। অধিকন্তু আদম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছে।

আমরা পূর্বে আস্তিক্যবাদীদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছি। তারা প্রথম জীবন্ত প্রাণীর দেহে প্রাণের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে এ সম্পর্কে বিতর্ককালে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে না পেরে বলে থাকে খোদায়ী ফুঁ থেকেই এই প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন হযরত আদম (আঃ)-এর মধ্যে খোদায়ী ফুঁ থেকে যেমন প্রাণের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করে ঠিক তেমনি অন্যান্য মানুষের প্রাণও খোদায়ী ফুঁ থেকেই উদ্ভুত বলে বিবেচনা করে থাকে।

জীবন বা প্রাণের উদ্ভব প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের যুক্তি এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, জীব হচ্ছে দৈহিক ও ইন্দ্রিয়গোচর দিগন্তের উর্ধ্বে বা বাইরে একটি নিরঙ্কুশ সৃষ্টির উদ্ভব। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিয়ম পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য যাই থাকুক, এর উৎস ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ঊর্ধ্বে একটি সমতলে নিহিত। এই যুক্তির দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে জীবন একটি মুহূর্তের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে, নাকি ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে– এই দুই ধারণার মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অবশ্যই প্রাণশূন্য এবং জীবন হচ্ছে একটি আলোকের মতো আর উচ্চতর একটি উৎস থেকেই এর উদ্ভব। এই ধারণার উপরই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যেখান থেকেই আসুন না কেন জীবন বা প্রাণের নিয়ম-প্রণালি সৃষ্টির নিয়মপ্রণালির মতো একই রকমের। বস্তু ও জীবনের অস্তিত্ব ও উৎস স্তরের মধ্যকার পার্থক্য বৈজ্ঞানিক ও প্রমাণিত বিষয়। আমরা যদি বস্তু ও জীবনের মধ্যে অস্তিত্বমানতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান পার্থক্যের মাধ্যমে প্রাণের অতিপ্রাকৃত উৎসের সন্ধান করতে চাই, তাহলে তা আমাদের জ্ঞানের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে হতে হবে, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে নয়। সুতরাং আল্লাহকে আমাদের সন্ধান করতে হবে আমাদের যে পথ জানা আছে সে পথে, অজানা পথে নয়। এজন্য একটি প্রাকৃতিক কারণ আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলে আমরা তার বিকল্প হিসাবে অতিপ্রাকৃতকে তার স্তর থেকে নিচে নামিয়ে আনতে বাধ্য নই। বরং আমাদের ধরে নিতে হবে যে, কোন একটি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, যদিও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি এখন পর্যন্ত সে স্তরে পৌঁছেনি।

সদরুল মুতাআল্লিহিন (মোল্লা সাদরা) এজন্য তাঁর 'আসফার' গ্রন্থে আত্মা সম্পর্কিত অংশে ফখরুদ্দিন রাযীর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি এই ব্যক্তি এবং তাঁর মতো অন্যান্য ব্যক্তির ব্যাপারে অবাক হয়ে যাই যখন দেখি তাঁরা তাওহীদ কিংবা এ ধরনের আরো কিছু ধর্মীয় মতবাদকে প্রমাণসাপেক্ষ করার জন্য উদাহরণস্বরূপ, প্রাকৃতিক কারণ জড়িত থাকার বিষয়কে স্বীকার করেন না এবং তাঁদের বিশ্বাস মতে সেখানে বিশ্বের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে।'

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের সময়কালে যেসব সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে তার মধ্যে একটি হলো, মানুষ কি কখনো কোন জীবন্ত প্রাণী তৈরি করতে সক্ষম হবে? উদাহরণস্বরূপ, মানষ কি এমন কৃত্রিম শুক্রাণু সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে যা নারীর গর্ভাশয়ে কিংবা অন্য কোন যথোপযুক্ত পরিবেশে স্থাপন করলে সেখানে কোন মানবসন্তানের জন্ম হবে? আমরা বলেছি, একদল আস্তিক্যবাদী এই ধরনের সম্ভাবনার কথা জোরালোভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। খোদায়ী ইচ্ছার সঙ্গে জীবনের সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের চিন্তাধারার পদ্ধতি হচ্ছে, প্রাণের উদ্ভব এবং জীবনের সূচনা ব্যতিক্রমী ধারার একটি ঘটনা। পবিত্র কুরআন থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তার ভিত্তিতে বলা যায়, এই ধরনের সম্ভাবনার পথে কোন বাধা নেই। এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে এবং দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে এটা নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে।

প্রথমত মানুষ কোনদিন জীবদেহের কোষের অংশসমূহের রাসায়নিক সংমিশ্রণ এবং একটি জীবন্ত কোষের উদ্ভব হওয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম পদ্ধতির সকল গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে কি পারবে না, তা প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটি জীবন্ত প্রাণীর কাঠামোগত জটিলতার পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোন মতামত দিতে পারছি না। কারণ, বিষয়টি আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, 'এই পৃথিবী, সৌরমণ্ডলের গ্রহসমূহ এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির চেয়েও অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ও উচ্চতর হচ্ছে যে জিনিসটি তা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজমের সার।'

দ্বিতীয়ত অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টির নিয়ম পদ্ধতি মানুষ যেভাবে উদ্ঘাটন করেছে সেভাবে যদি জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টির নিয়মপদ্ধতির রহস্যও কোনদিন উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়, সেগুলোর সকল শর্ত ও বস্তুগত উপাদানসমূহ আবিষ্কারে সফল হয় এবং

জীবন্ত প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরস্থ সার বস্তুর মতো হুবহু পদার্থ আবিষ্কারে সক্ষম হয় তা হলে এগুলো দিয়ে তৈরি কৃত্রিম সত্তার মধ্যে কি জীবন বা প্রাণের সঞ্চার হওয়া সম্ভব? এর জবাব হচ্ছে, এই কৃত্রিম সত্তার মধ্যে অবশ্যই প্রাণ আসা সম্ভব। কারণ, সৃষ্টির উদ্ভবের সকল শর্তের অস্তিত্ব যদি বিদ্যমান থাকে তা হলে তা উদ্ভব না হওয়াটাই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বিষয়টি কি এরূপ নয় যে, সকল সৃষ্টির একচ্ছত্র উৎস হচ্ছে এক, স্বয়ম্ভু নিরঙ্কুশ পবিত্র খোদায়ী সত্তা?

এখানে কারো কারো মনে এ রকম সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, বিষয়টা যদি এই ধরনেরই হয় তা হলে জীবন যে একমাত্র আল্লাহর হাতে এবং জীবন দান ও জীবন নিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অন্য কারো যে কোনরূপ ভূমিকা নেই– এই ধারণার কি হবে? আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এটা হচ্ছে সেই বিষয় যা পবিত্র কুরআনে স্বীকার করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলেই এই প্রশ্নের জবাব পরিষ্কার হয়ে যাবে। মানুষের পক্ষে কি এই ধরনের ক্ষমতা অর্জন করা একদিন সম্ভব হবে? মানুষ যেটা করতে সক্ষম হবে সেটা হলো জীবন বা প্রাণের উদ্ভবের শর্তসমূহ প্রস্তুত করা, কিন্তু সে জীবন বা প্রাণ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। মানুষ কোন কিছুতে প্রাণ দিতে পারে না, তবে প্রাণ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অধিকারী করে দিতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, মানুষ হচ্ছে গতিশীল সৃষ্টির কারক, সত্তার উৎস নয়।

মানুষ যদি এই রকম একটা কিছু করতে সক্ষম হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চিতভাবেই সেটা হবে একটা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। তবে জীবন সৃষ্টিতে ভূমিকার দৃষ্টিকাণ থেকে বলতে গেলে বলা যায়, সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা কিংবা গম থেকে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকের ভূমিকা যেরূপ, জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা তদ্রূপই হতে পারে। এই সকল ঘটনার ক্ষেত্রে মানুষ জীবন বা প্রাণের সৃষ্টিকারক বা স্রষ্টা নয়। এসব ক্ষেত্রে মানুষ বস্তুর প্রাণলাভের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূরণ করে থাকে। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ওয়াকিয়ায় সবচেয়ে সম্ভাব্য সুন্দর পন্থায় এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি একে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি?' (সূরা ওয়াকিয়া : ৬৩-৬৪)

একই সূরার ৫৮ ও ৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?'

নবী-রাসূলগণ যে মোজেজা দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে বলা যায়, তাঁদের মধ্যে মোজেজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মানুষ তাদের সাধারণ জ্ঞান ও ক্ষমতার দ্বারা এসব কাজ করতে অক্ষম। একটি অসাধারণ ক্ষমতা ও জ্ঞান নবী-রাসূলগণের মধ্যে ছিল যা তাঁদেরকে দৈহিক প্রকৃতির স্তর থেকে ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছিল এবং এ ধরনের বিস্ময়কর কর্ম সম্পাদনের উৎসে পরিণত হয়েছিল। মানুষ যদি একদিন এই বিষয়ে অর্থাৎ কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সফল হয় তা হলে তার অর্থ এই হবে না যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে নবী-রাসূলগণ যে বিস্ময়কর কর্ম সম্পাদন করেছেন এটা সে রকম। আল্লাহর অনুমতি নিয়েই নবী-রাসূলগণ মৃত মানুষের মধ্যে জীবন দান করতেন এবং তা নিয়ে নিতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি কোনদিন এই ধরনের কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা অর্জন করে তা হলে সে শুধু জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ বা পরিস্থিতিই সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, এর বেশি নয়। একইভাবে যেমন আজকের দিনে মানুষ জীবন নিয়ে নেয়ার ক্ষমতা অর্জন ছাড়াই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ বা পরিস্থিতি ধ্বংস করার মাধ্যমে মানুষের মৃত্যু ঘটানোর ক্ষমতা অর্জন করেছে। মানুষ যদি কোনদিন জীবন সৃষ্টি ও তা নিয়ে নেয়ার নিয়মপদ্ধতি আবিষ্কার করার মাধ্যমে জীবনের অস্তিত্বের সারবস্তু প্রস্তুত কিংবা ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করতেও সক্ষম হয় তবুও জীবন দান ও জীবন নিয়ে নেয়ার বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতেই থাকবে।

মে'রাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান

মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ হচ্ছে ইসলামের অকাট্য সন্দেহাতীত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিতও হয়েছে। আর তখনই মে'রাজ আধুনিক বিজ্ঞান ও মানব বুদ্ধিমত্তার পরিপন্থী বলে গণ্য হবে যখন এটাকে মহানবী (সা.) এর মো'জেযা ও অলৌকিক বিষয় বলে গণ্য করা হবে না। উদাহরণস্বরূপ মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে অনেক বাধা-বিপত্তি ও সমস্যা রয়েছে। আর ঐ যুগে এ সব সমস্যা বিদ্যমান এবং (মহাকাশ যাত্রার) প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণাদির অভাব থাকার কারণে মহানবী (সা.) কিভাবে আসমানসমূহে গমন করেছিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে বোধগম্য হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে মে'রাজের সংজ্ঞা দেয়া প্রয়োজন।

মে'রাজ অর্থ

আভিধানিক অর্থ : মে'রাজ (معراج) শব্দটি উরূজ (عروج) ধাতু থেকে উৎসারিত। আর এ উরূজ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঊর্ধ্বগমন। যে রাতে দু'আ (প্রার্থনা) ঊর্ধ্বলোকে গমন করে সেই রাতকে 'লাইলাতুল মে'রাজ' (ليلة المعراج) অর্থাৎ মে'রাজের রজনী বা শবে মে'রাজ বলা হয়। সুতরাং মে'রাজ শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে পৃথিবী ও উচ্চ জগৎ পরিভ্রমণ।

পারিভাষিক অর্থ : মে'রাজের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে আসমানসমূহে মহানবী (সা.)-এর অলৌকিক ভ্রমণ। রেওয়ায়াতসমূহের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ দুধাপে সংঘটিত হয়েছে :

ক. মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত মহানবীর সফর এবং সেখান থেকে মসজিদুল হারামে প্রত্যাবর্তন যা সূরা ইসরার প্রথম আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

سُبْحَانَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا

'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি (আল্লাহ) যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিকালে সম্মানিত মসজিদ (কা'বা) হতে মসজিদে আকসা অবধি পরিভ্রমণ করিয়েছিলেন...'

এ অংশটিকে ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে পারিভাষিক ভাবে 'ইস্‌রা' (اسراء) অর্থাৎ নৈশ ভ্রমণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় ধাপ : মসজিদুল আক্‌সা থেকে আসমানসমূহের দিকে যাত্রা। রেওয়ায়াতসমূহ অনুসারে এই যাত্রা পথে তিনি নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন ও কথা বলেছিলেন এবং জান্নাত-জাহান্নাম ও মহান আল্লাহ্‌র সুমহান নিদর্শনাদিও দর্শন করেছিলেন। এই অংশটিকে পারিভাষিক অর্থে মে'রাজ বলা হয়।

মে'রাজের বিবরণ

মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ পবিত্র কোরআনের দুটি সূরায় সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। সূরাদ্বয় হচ্ছে সূরা ইসরা এবং সূরা নাজ্‌ম। পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সংক্ষেপে মে'রাজের বিবরণ নিচে প্রদান করা হলো :

মশ্‌হুর অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, এই ভ্রমণ রাতের বেলায় এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মক্কায় বসবাসকালের শেষ বছরগুলোয় সংঘটিত হয়েছিল। তবে এ ভ্রমণ কোন্ রজনীতে হয়েছিল– এতদসংক্রান্ত মুতাওয়াতির (অকাট্য সূত্রে উল্লিখিত) বর্ণনা বিদ্যমান নেই। আল্লামা মাজলিসী বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে তিনটি অভিমত উল্লেখ করে বলেছেন : '১৭ রবিউল আওয়ালের রাত, ২৭ রজবের রাত এবং একটি বর্ণনায় ১৭ রমযানের রাত উল্লিখিত হয়েছে।'

এটাই প্রসিদ্ধ যে, মহানবী (সা.) ঐ রাতে আবু তালিবের মেয়ে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন এবং সেখান থেকেই মে'রাজ গমন করেন। তাঁর মসজিদুল আক্সা ও আসমানসমূহে গমন এবং ফিরে আসা এক রাতের বেশি ছিল না। মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "আমি উম্মে হানীর ঘরে যখন নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি এক অবস্থায় ছিলাম তখনই হযরত জিব্রাঈল এসে বললেন : 'হে মুহাম্মাদ! উঠুন।' আমি উঠে দাঁড়ালাম। জিব্রাঈল আমার হাত ধরে আমাকে যমযমের দিকে নিয়ে গেলেন। এক ফেরেশতাকে তিনি বললেন : 'যাও কিছু যমযম ও কাওসার নহরের পানি নিয়ে এসো যাতে মুহাম্মাদ করে ওজু করেন।' উক্ত ফেরেশতা পানি আনলে আমি তা দিয়ে ওজু করলাম। অতঃপর জিব্রাঈলের নির্দেশে আমি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম। এরপর জিব্রাঈল হাত ধরে আমাকে মসজিদের বাহিরে আনলেন। যখন আমি বাইরে আসলাম তখন মসজিদের দরজার সামনে বুরাক দেখতে পেলাম। জিব্রাঈল আমাকে বললেন : 'বুরাকের ওপর উঠুন। এটা হচ্ছে সেই বাহন যাতে চড়ে ইবরাহীম (আ.) কাবা যিয়ারত করতে আসতেন।' আমি বুরাকের ওপর সাওয়ার হলাম এবং তা আমাকে মসজিদুল আক্সায় এবং সেখান থেকে আসমানসমূহে নিয়ে যায় এবং সেখানে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় প্রত্যক্ষ করি এবং সৃষ্টির রহস্যাবলীর সাথে পরিচিত হই। অতঃপর বুরাক আমাকে পবিত্র মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে।'

রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, বুরাক কয়েকটি স্থানে থামে এবং মহানবী (সা.) সে সব জায়গায় নামায পড়েন। যেমন কুফার মসজিদ, সিনাই পর্বত, বাইতুল লাহ্ম (হযরত ঈসার জন্মস্থান)। অতঃপর মহানবী (সা.) মসজিদুল আক্সায় প্রবেশ করে সেখানে নামায পড়লেন এবং সেখান থেকে আসমানসমূহে গমন করেন।

ইবনে হিশাম নিজ সীরাহ্ গ্রন্থে মে'রাজের হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে হানী বলেন : "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ রাতে আমার গৃহেই ছিলেন; তিনি ইশার নামায পড়লেন এবং ঘুমালেন। আমরাও তাঁর সাথে ঘুমালাম। ফজরের সময় হলে তিনি আমাদের ঘুম থেকে জাগালেন এবং ফজরের নামায পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। তখন তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন : 'হে উম্মে হানী! আমি আজ রাতে যেমন তোমরা দেখেছ তোমাদের সাথে ইশার নামায এখানেই পড়ি; অতঃপর আমি বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করে সেখানে কয়েকবার নামায আদায় করি। যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তেমনি আমি পুনরায় এখানে এসে

ফজরের নামায পড়ি।' এ কথা বলে তিনি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি হাত দিয়ে তাঁর পোশাকের প্রান্ত এমনভাবে টেনে ধরলাম যে, তাঁর জামা পেছনে সরে আসল। আমি তখন তাঁকে বললাম : 'হে রাসূল (সা.)! আমাকে যে এ কথা বললেন তা অন্যদেরকে বলেন না। কারণ, তারা আপনার কথা প্রত্যাখ্যান করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। কিন্তু তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমি তাদের সবাইকে বলব।' উম্মে হানী বলেন : 'আমার হাবশী দাসীকে বললাম : 'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিছে পিছে গিয়ে দেখ যে লোকজন তাঁর সাথে কেমন আচরণ করছে এবং তাদের কথাবার্তাও আমাকে বলবে।' দাসী চলে গেল। সে ফিরে এসে আমাকে বলল : 'মহানবী (সা.) যখন তাঁর কাহিনী লোকদেরকে বললেন তখন তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল : 'আপনার কথা যে সত্য তার প্রমাণ কী এবং আমরা কিভাবে বুঝব যে, আপনি সত্য বলছেন?' মহানবী (সা.) বললেন : 'এর প্রমাণ হচ্ছে অমুক কাফেলা। শাম যাওয়ার সময় তাদেরকে অমুক জায়গায় দেখি এবং তাদের উটগুলো বুরাকের চলার শব্দে ভীত হয়ে যায় এবং একটি উট সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আমি উক্ত কাফেলাকে জানালাম যে, পালাতক উটটি কোথায়? ফেরার সময় আমি দাজ্‌নান্ (মক্কা নগরী থেকে ২৫ কি. মি. দূরে) মঞ্জিলে অমুক কাফেলাকে দেখি যাদের সবাই ঘুমিয়ে ছিল। আর তাদের পানির পাত্র তাদের মাথার কাছে রাখা ছিল এবং তারা ঐ পাত্রটির মুখ একটা কিছু দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। উক্ত কাফেলা এখনই তান্‌ঈম্ উপত্যকা দিয়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করবে। আর এর নিদর্শন হচ্ছে, তাদের অগ্রভাগে ছাই রঙের একটি উট আছে এবং ঐ উটের ওপর রয়েছে দুটি বোঝা। আর উক্ত বোঝাদ্বয়ের একটি কালো রঙের।' যখন লোকেরা এ কথা শুনল তখন তারা তান্‌ঈম্ উপত্যকার দিকে ছুটে গেল এবং মহানবী (সা.) যে সব নিদর্শন উল্লেখ করেছিলেন সেগুলোসমেত উক্ত কাফেলাকে তান্‌ঈম্ উপত্যকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে দেখল। অপর কাফেলাটি মক্কা নগরীতে আসলে লোকজন তাদের কাছে তাদের উটগুলোর আতঙ্কিত হওয়া এবং তাদের একটি উটের পালিয়ে যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করে এবং উক্ত কাফেলার লোকজনও তাঁকে সত্যায়ন করে।"

অতঃপর মূল মে'রাজ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। আল্লামা তাবাতাবাঈ এতদপ্রসঙ্গে বলেন : মূল ইস্‌রা (নৈশ ভ্রমণ) এবং মে'রাজ হচ্ছে ঐ সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যাতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। কারণ, পবিত্র কোরআনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা

করা হয়েছে এবং শিয়া-সুন্নী মাযহাব নির্বিশেষে মুতাওয়াতির সূত্রে মাহানবী (সা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আর আহলে বাইতের ইমামদের থেকেও এতদপ্রসঙ্গে অগণিত রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। আমরা এখন কয়েকটি হাদীস নমুনাস্বরূপ নিচে উল্লেখ করব :

ক. সূরা ইসরার ১ম আয়াত :

سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَـٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَـٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١﴾

'পবিত্র ও মহিমাময় তিনি (আল্লাহ) যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিকালে সম্মানিত মসজিদ (কা'বা) হতে মসজিদে আকসা– যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা প্রাচুর্যতায় সমৃদ্ধ করেছি– অবধি পরিভ্রমণ করিয়েছিলেন; যাতে আমরা তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখাই; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'

খ. ইমাম জাফর সাদেক (আ.) এতদপ্রসঙ্গে বলেন :

ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء: المعراج و المسألة فى القبر و خلق الجنة و النار و الشفاعة

'যে কেউ মে'রাজ, কবরে সওয়াল-জবাব, বেহেশ্‌ত ও দোযখের সৃষ্টি এবং শাফায়াত– এ চারটি বিষয় অস্বীকার করবে সে আমাদের অনুসারী হবে না।'

গ. ইমাম রেযা (আ.) বলেন :

من كذب بالمعراج فقد كذب رسول الله

'যে ব্যক্তি মে'রাজ অস্বীকার করল আসলে সে মহানবী (সা.)-কেই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করল।'

মেরাজ কি দৈহিক না আত্মিক?

মে'রাজ প্রসঙ্গে এ প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয় যে, মেরাজ কি দৈহিক না আত্মিক? এ বিষয়টি উল্লিখিত সংশয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, মে'রাজ সংক্রান্ত আপত্তি মে'রাজের দৈহিক (শারীরিকভাব সংঘটিত) হওয়ার সাথেই একান্ত সংশ্লিষ্ট। এতদসংক্রান্ত যে সব তত্ত্ব ও অভিমত প্রচলিত আছে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. ইসরা ও মে'রাজ আত্মিক (আধ্যাত্মিক)

জাহমিয়া সম্পদায় বিশ্বাস করে যে, মে'রাজ ছিল আধ্যাত্মিক (আত্মিক) এবং তা স্বপ্নে সংঘটিত হয়েছিল। যারা এ তত্ত্ব গ্রহণ করেছে তারা তাদের এ দাবী প্রমাণ করার জন্য দুটি প্রমাণ উত্থাপন করেছেন:

ক. দৈহিক মে'রাজ বুদ্ধিবৃত্তির সাথে মোটেও খাপ্ খায় না। কারণ, মুসলিম দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রথমত স্থূল দেহ ঊর্ধ্বলোকে উড্ডয়ন করতে ও যেতে সক্ষম নয় এবং হালকা দেহের ঊর্ধ্বে থাকে বিধায় আকাশের দিকে উড্ডয়ন অসম্ভব। দ্বিতীয়ত আমরা যদি দৈহিক মে'রাজ মেনে নেই তাহলে এর ফলে নভোমণ্ডলে ফাটল ও চিড় দেখা দেবে। কারণ, স্থূল দেহ তা ভেদ করবে বিধায় আবার সেই ফাটল মিলে যাবে অথচ নভোমণ্ডলের ফাটল এবং তা মিলে যাওয়া দার্শনিক দলিল-প্রমাণাদি অনুসারে মোটেও সিদ্ধ নয়। তৃতীয়ত স্থূলদেহের ঊর্ধ্বে গমন এবং জগৎসমূহে ভ্রমণ অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার অথচ মে'রাজ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয় নি; বরং কেউ কেউ বলেন যে, মে'রাজ এক মুহূর্তেরও বেশি স্থায়ী হয় নি। আর এটাই হচ্ছে মে'রাজের আধ্যাত্মিক হওয়ার প্রমাণ।

দার্শনিকদের এ আপত্তির জবাবে ইসলামী কালাম শাস্ত্রবিদ ও আলেমগণ বলেন : মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ দৈহিক ছিল এবং এই জড় দেহ নিয়ে তিনি সকল জগৎ পরিক্রমণ করেন, এমনকি আরশ ও কুরসি যা হচ্ছে তাঁদের (কালাম শাস্ত্রবিদ ও আলেমগণ) বিশ্বাসে অষ্টম ও নবম নভোমণ্ডল, সে পর্যন্ত তিনি গমন করেন এবং যাবতীয় নভোমণ্ডলীয় সৃষ্টিকেও প্রত্যক্ষ করেন। তবে যে সব আপত্তি দার্শনিকরা করেছেন, যেমন এ আপত্তি– 'মে'রাজ যদি দৈহিক হয়ে থাকে এর ফলে নভোমণ্ডলে ফাটল দেখা দেবে', সেগুলো নভোমণ্ডল সংক্রান্ত তাঁদের বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। আর তা হচ্ছে, আকাশ (নভোমণ্ডল) হচ্ছে স্থূল পদার্থ। তাই যদি মহানবী (সা.) স্থূল দেহ নিয়ে আকাশে গমন করে থাকেন তাহলে আকাশ অবশ্যই বিদীর্ণ হবে এবং

তারপর এই ফাটল আবার মিলে যাবে। আর এটা মানব বুদ্ধিবৃত্তির সাথে মোটেও খাপ খায় না। অথচ আকাশ যে স্থূল পদার্থ এতদসংক্রান্ত দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির অসারত্ব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রমাণিত হয়ে যায়।

খ. বেশ কিছু সংখ্যক হাদীসও আছে যেগুলোর বাহ্য অর্থ হচ্ছে, মে'রাজ হলো আত্মিক। যেমন ইয়াকূব ইবনে উত্বার বর্ণিত রেওয়ায়াত :

كانت رؤيا من الله صادقة

'মে'রাজ ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য স্বপ্ন' অর্থাৎ এ মে'রাজ তাঁর নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল।

হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে :

ما فقد جسد رسول الله (ص) و لكن الله أسرى بروحه

'মহান আল্লাহ্র শপথ, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দেহ আমাদের মধ্য থেকে (ঊর্ধ্বলোকে) নিয়ে যাওয়া হয় নি; বরং মহান আল্লাহ্ই তাঁর আত্মাকে আসমানসমূহে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।'

তবে এ সব রেওয়ায়াত প্রথমত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং মে'রাজ প্রসঙ্গে যে সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছিল তা দূর করার লক্ষ্যেই এ সব রেওয়ায়াতের অবতারণা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ বিষয়টি শিয়া-সুন্নী সূত্রে বর্ণিত অগণিত রেওয়ায়াত ও হাদীসেরও পরিপন্থী। তৃতীয়ত মহানবী (সা.)-এর নৈশ ভ্রমণ (ইস্রা) ও মে'রাজকালে হযরত আয়েশা জন্মগ্রহণ করেন নি নতুবা শিশু ছিলেন এবং (মে'রাজ সংঘটিত হওয়ার) বহু বছর পরে তিনি বধু হয়ে মহানবী (সা.)-এর গৃহে পদার্পণ করেছিলেন। আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত আলেম ইবনে হাজার আসকালানীও লিখেছেন : 'হযরত আয়েশা মহানবী (সা.)-এর বে'সাতের (নবুওয়াত ঘোষণার) ৪/৫ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১ম বা ২য় হিজরীতে ৯ বছর বয়সে মহানবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।'

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর ইস্রা ও মে'রাজ বে'সাতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। আর হযরত আয়েশা তখনও জন্মগ্রহণ করেন নি । তবে যদি আমরা বলি যে, এ ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদ করেছিলেন তাহলে তা হবে ভিন্ন কথা।

২. একটি পর্যায়ে দৈহিক ও একটি পর্যায়ে আত্মিক

পবিত্র মক্কা নগরী থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণ ছিল দৈহিক এবং বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মহাকাশসমূহ এবং ঐশী মহিমার জগৎ অর্থাৎ আলামে মালাকূত পানে তাঁর উড্ডয়ন ছিল আত্মিক-আধ্যাত্মিক।

এ অভিমত শেখ আহ্মাদ্ আল-আহ্সাঈ-এর অনুসারীরা (শাইখিয়াহ্ সম্প্রদায় বলে পরিচিত) উত্থাপন করেছে। তারা বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) স্থূল দেহের প্রতিটি গাঠনিক উপাদান বা মৌল (عنصر) কে উক্ত মৌলের জগতেই রেখে যান এবং পানি, মাটি, বায়ু ও অগ্নি জগৎ অতিক্রম করার পর হুরাক্লিয়াঈ দেহ (যা হচ্ছে মিসালী অর্থাৎ জড় এবং অজড়ের মধ্যবর্তী অবস্থার সূক্ষ দেহ) নিয়ে আসমানসমূহ পরিক্রমণ করেন।

যায়দিয়াহ্ ও মু'তাযিলাহ্ সম্প্রদায়ও এ অভিমত গ্রহণ করে বলেছে যে, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ ছিল আত্মিক-দৈহিক। সূরা ইস্রার আয়াতে 'মসজিদুল আক্সার দিকে' (إلى المسجد الأقصى) বাক্যটি বিদ্যমান এবং এরপর সেখান থেকে আসমানসমূহে তাঁর ভ্রমণটা ছিল আত্মিক-আধ্যাত্মিক।

৩. ইস্রা (নৈশ ভ্রমণ) ও মে'রাজ (ঊর্ধ্বলোকে উড্ডয়ন) দৈহিক (جسماني) এবং তা তাঁর জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল।

মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ, পণ্ডিত এবং আলেমদের মধ্যে প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ ছিল বাস্তব ও দৈহিক। আর এটা ইসলামের সন্দেহাতীত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। উল্লেখ্য, মে'রাজ সংক্রান্ত এ অভিমতটিই আসলে সঠিক; আর পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং হাদীস ও রেওয়ায়াতসমূহও সুস্পষ্ট ভাষায় মহানবীর মে'রাজ যে দৈহিক ও আত্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল তা ব্যক্ত করে। আর প্রখ্যাত শিয়া মুফাস্সির ও ফকীহ্ আল্লামা তাবারসীও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ মাজমাউল বায়ানে মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ যে দৈহিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল এতদসংক্রান্ত (শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে) সকল মুসলিম আলেমের ঐকমত্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

একইভাবে আল্লামা মাজলিসী এবং আহলে সুন্নাতের প্রখ্যাত মুফাস্সির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বিশ্বাস করেন যে, গবেষক আলেমগণ এ বিশ্বাস পোষণ করেন,

পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং শিয়া-সুন্নী সূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ অনুসারে মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে তাঁর আত্মা ও দেহসমেত পবিত্র মক্কা নগরী থেকে মসজিদুল আক্সায় এবং এর পর সেখান থেকে আসমানসমূহে নিয়ে যান। আর এ বিষয়টিকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান অথবা এটাকে আত্মিক উরূজ (মে'রাজ) বলে তাবীল্ ও ব্যাখ্যা করা অথবা নিদ্রায় তাঁর মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল ইত্যাদি বলা আসলে স্বল্প অধ্যয়ন ও অল্প বিদ্যা অথবা দুর্বল ধর্ম-বিশ্বাস থেকে উৎসারিত।

দৈহিক ও শারীরিকভাবে মে'রাজ সংঘটিত হওয়ার দলিল-প্রমাণ

মহানবী (সা.)-এর দৈহিক মে'রাজ সংক্রান্ত অগণিত দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান। আলোচনা নাতিদীর্ঘ করার লক্ষ্যে এখানে কেবল কয়েকটি দলিল আমরা উল্লেখ করব :

১. سبحان الذى أسرى بعبده... 'সেই সত্তা পবিত্র, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতে সম্মানিত মসজিদ হতে দূরতম মসজিদে নিয়ে গিয়েছিলেন'– এ আয়াতে বিদ্যমান أسرى بعبده (স্বীয় বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছিলেন) বাক্যাংশটিতে মহানবী (সা.)-এর দৈহিক মে'রাজের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কারণ, 'আব্দ' (عبد) শব্দটি দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবীর এ সফর জাগ্রত অবস্থায় এবং দৈহিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। 'অমুক ব্যক্তিকে অমুক স্থানে নিয়ে গেলাম'– এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে তাকে তার দেহ ও আত্মাসমেতই উক্ত নির্ধারিত স্থানে নিয়ে গেছি, কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় অর্থাৎ স্বপ্নে উক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে এ স্থলে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা স্বপ্নে কোন স্থানে নিয়ে যাওয়ার নিদর্শন (ক্বারীনাহ্) বাক্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তা হবে ভিন্ন কথা। আয়াতুল্লাহ্ জাফর সুবহানী মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ যে সশরীরে হয়েছিল তার সমর্থনে বলেছেন : 'কুরাইশরা মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ অর্থাৎ পবিত্র মসজিদুল আক্সা গমন এবং সেখান থেকে আকাশসমূহে উড্ডয়নের সংবাদ শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হলো এবং তা অস্বীকার করল। মহানবী (সা.)-এর মে'রাজের ঘটনা কুরাইশদের বিভিন্ন মহলে দৈনন্দিন বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। মহানবী (সা.)-এর এ ভ্রমণ যদি কেবলই স্বপ্নে হয়ে থাকত তাহলে

কুরাইশদের তা অস্বীকার এবং এ ব্যাপারে হট্টগোল করার কোন অর্থই হয় না। কারণ, 'আমি এক রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় এমন স্বপ্ন দেখলাম'– এ ধরনের কথায় কখনো বাকবিতণ্ডা ও হৈচৈ দেখা দেবে না। যেহেতু কুরাইশরা এ বিষয়টি নিয়ে তুমুল হট্টগোল করে সেহেতু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ সশরীরে হয়েছিল এবং মে'রাজ যে সশরীরেই হয়েছিল সেটা তিনি নিজেও দাবী করেছিলেন।

২. سبحان الذى (সেই পবিত্র সত্তা যিনি) এ বাক্যাংশ যা সূরা ইসরার শুরুতেই এসেছে তা গুরুত্বপূর্ণ এ ঘটনাটি যে অলৌকিক তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে। অর্থাৎ উক্ত আয়াত থেকে বোধগম্য হয় যে, মানুষ যাতে এ মে'রাজের ঘটনা অসম্ভব বলে মনে না করে সেজন্য মহান আল্লাহ্ সকল ধরনের ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে নিজেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। আর তা না হলে দেহবিহীন আত্মা যা পার্থিব (জড়) জগতের সকল সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত সেই আত্মার এ ধরনের সফর ও ঊর্ধ্বলোক গমনের ঘটনা ব্যক্ত করার জন্য এ ধরনের ভাষাশৈলীরও কোন প্রয়োজন নেই।

৩. সূরা নাজ্‌ম-এ 'দর্শন' অর্থাৎ প্রত্যক্ষকরণ (رويت) ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে :

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾

'মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিভ্রম ও বিচ্যুতি হয় নি। তিনি মহান আল্লাহ্‌র সুমহান নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।'

এ দুই আয়াত থেকে ভালোভাবে বোধগম্য হয় যে, এ দর্শন আসলে ঘুমন্ত অবস্থায় ও আত্মিকভাবে সংঘটিত হয় নি; বরং মহানবী (সা.)-এর জাগ্রত অবস্থায় সশরীরেই হয়েছিল।

৪. আল্লামা যামাখ্‌শারী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার একটি অংশে বর্ণিত হয়েছে :

و قد عرج به إلى السماء فى تلک الليلة ... و انه لقى الانبياء و بلغ البيت المعمور و سدرة المنتهى.

ঐ রাতে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল... তিনি নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং বায়তুল মা'মূর ও সিদরাতুল মুন্‌তাহা পর্যন্ত গিয়েছিলেন...। এ হাদীসে عرج به (তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল)– এ বাক্যটি মহানবী (সা.)-এর সশরীরে মে'রাজকেই ইঙ্গিত করে। অতএব, এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে সব রেওয়ায়াতে আত্মিক মে'রাজের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের বাহ্য অর্থের পরিপন্থী বিধায় বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মে'রাজের ঘটনা ও এর দলিল-প্রমাণাদি বর্ণনা করার পর মে'রাজ সংক্রান্ত সংশয়ের কিছু জবাব দেয়া সম্ভব :

১. নিঃসন্দেহে মে'রাজ কোন স্বাভাবিক ও সাদামাটা বিষয় নয়; বরং এটা হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর অন্যতম মোজেযা। আর যেহেতু মোজেযা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অসম্ভব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না, তাই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মে'রাজ সম্ভব এবং তা অসম্ভব কোন কিছু নয়। আর তা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও পরিপন্থী নয়। কারণ, বর্তমান মানুষ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে এমন সব যানবাহন তৈরী করার সামর্থ্য অর্জন করেছে যা পণ্য ও পদার্থকে দ্রুত স্থানান্তর করতে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলয় ভেদ করে মহাশূন্যে যেতে সক্ষম, তাহলে মহান আল্লাহর পক্ষে কি ভ্রমণের সাথে সংগতিপূর্ণ দ্রুতগামী মহাকাশযান তাঁর নবী (সা.)-এর হাতে অর্পণ করা সম্ভব নয় যা তাঁকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য সব ধরনের বায়ুমণ্ডলীয় (ও মহাকাশীয়) বিপদ থেকে রক্ষা করবে?

২. মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ সর্বপ্রথম কোন অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক বিষয় ছিল না; বরং পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যেও এর নজির বিদ্যমান। যেমন সুলায়মান (আ.)-এর এখতিয়ারে বাতাস বশীভূত করে দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা তাঁকে দ্রুত কাঙ্ক্ষিত স্থানে নিয়ে যেত। হযরত ঈসা মসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর কাছে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :

...وما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم و إن الذين اختلفوا فيه لفى شک منه ما لم به من علم إلا اتباع الظن و ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه

'অথচ তারা তাকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, নিশ্চয় তারা এ বিষয়ে সন্দেহে ছিল;

এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি; বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।'

সুতরাং পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে আসমানসমূহে হযরত ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেয়া, দূরবর্তী স্থানসমূহে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাতাসের মাধ্যমে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর গমনাগমন ইত্যাদি যখন অকাট্য ও সন্দেহাতীত বিষয় বলে গণ্য হয়েছে তখন বিবেক-বুদ্ধি (আক্‌ল্) এ বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম যে, মহানবী (সা.)-এর নৈশ ভ্রমণ ও মে'রাজও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সম্ভব এবং উপলব্ধিযোগ্য বিষয় হবে। আর তা কারো পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়।

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে অস্তিত্বজগতে বহু রহস্য ও আশ্চর্যজনক বিষয় বিদ্যমান। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির কারণে মানুষ সবেমাত্র অস্তিত্বজগতের এ সব রহস্যের অতি সামান্য অংশ উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আকাশসমূহে জীব বা প্রাণীকূলের অস্তিত্ব যার প্রতি ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের আয়াত ও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথচ মানুষ সম্প্রতি এ ব্যাপারে ধারণা ও জ্ঞান লাভ করেছে। যেমন : 'মহাশূন্য' ম্যাগাজিনের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (১৫/১/১৩৫১ ফার্সী সাল) 'পালোমার অবজারভেটরী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল : পালোমার অবজারভেটরীর (মানমন্দির) টেলিস্কোপ (দূরবীণ) প্রস্তুতের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেখা মহাবিশ্বের আয়তন ৫০০ আলোক বর্ষের বেশি ছিল না। তবে এ দূরবীণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের আয়তন একহাজার মিলিয়ন (১০০ কোটি) আলোকবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছেছে ও সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এর ফলে মিলিয়ন-মিলিয়ন নতুন গ্যালাক্সি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলোর কোনটি এ পৃথিবী থেকে একশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। এই একশ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের পরে এক ভয়ঙ্কর নিকষ কালো অসীম মহাশূন্য রয়েছে যার মাঝে কোন বস্তু বা পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্থাৎ কোন আলোই উক্ত আঁধার (অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাশূন্য) অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। আর এর ফলে পালোমোর অবজারভেটরীর দূরবীণ-ক্যামেরার ফটোগ্র্যাফিক প্লেটে কোন চিত্রই আর ধরা পড়ে না। নিঃসন্দেহে উক্ত ভয়ঙ্কর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাশূন্যে শত শত মিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে এবং যে বিশ্ব আমাদের দিকে রয়েছে তা গ্যালাক্সিসমূহের পারস্পরিক আকর্ষণ শক্তির দ্বারা সংরক্ষিত হচ্ছে। এ বিশাল জগৎ যা আমাদের

দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং যাতে শত শত বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে আসলে এগুলো সামগ্রিকভাবে এর চেয়েও আরো বিশাল বিশ্বের একটি অতি সামান্য অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখনও আমরা সুনিশ্চত হতে পারি নি যে, উক্ত দ্বিতীয় বিশ্বের পরে আরেকটি বিশ্ব বিদ্যমান নেই। আমাদের এই সৌরতন্ত্র যে গ্যালাক্সিতে অবস্থিত সেই গ্যালাক্সিও ঊর্ধ্বতন জগতের হাজার হাজার গ্যালাক্সির মধ্যে একটি। আর এই গ্যালাক্সিতেও শত শত মিলিয়ন সূর্য ও উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে যেগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে মিলিয়ন-মিলিয়ন বসবাসযোগ্য গ্রহ রয়েছে যেগুলোয় বিলিয়ন-বিলিয়ন জীব বিদ্যমান আছে ও বসবাস করছে।'

এটা হচ্ছে আজকের মানবজাতির আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বীকারোক্তিসমূহের একটি নমুনামাত্র। তাতে বলা হয়েছে যে, ঊর্ধ্ব জগতের কতিপয় গ্রহে প্রাণী আছে। কিন্তু ১৪ শতাব্দী আগে অর্থাৎ মহাশূন্য বিজ্ঞান এবং পৃথিবীর বৃহত্তম মানমন্দিরসমূহ কতিপয় গ্রহে জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে কথা বলার আগেই পবিত্র কোরআনে এ বাস্তবতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে :

ক.

و لله يسجد ما فى السماوات و ما فى الأرض من دابة و الملائكة

'আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে যত প্রাণী ও জীব আছে সেগুলো সব এবং ফেরেশতারা একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সিজদা করে। '

খ.

ومن آياته خلق السماوت و الأرض و ما بث فيهما من دابة

'তাঁর (মহান আল্লাহ্‌র মহিমা ও ক্ষমতার) নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ে যে সব জীব ও প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো।'

ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'এ নক্ষত্ররাজি যা আকাশে আছে সেগুলোয় পৃথিবীর শহর ও নগরসমূহের মত শহর ও নগর রয়েছে।'

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি (hypothesis) মেনে নেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তরঙ্গমালা অতি অল্প সময়ের

মধ্যেই জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে স্থানান্তরিত হতে এবং প্রভাব ফেলতে সক্ষম। পূর্ণতার জ্ঞানে গোটা অস্তিত্ব জগতের ধাবমানতা ও গতির ক্ষেত্রে এমন সব তন্ত্র (System) আছে যেগুলো আলোর গতির চেয়েও চোখ ধাঁধাঁনো আরো তীব্র গতিতে বিশ্বজগতের কেন্দ্র ও মেরু হতে দূরে সরে যাচ্ছে; আর যখন অস্তিত্বজগতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধারণার বাইরে এ ধরনের প্রপঞ্চ বাস্তবে বিদ্যমান তখন মে'রাজের মত কোন ঘটনাও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব বলে গণ্য হবে না এবং তা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক সূত্র ও নীতিমালার সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল হবে।

৫. মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে অনেক বাধা ও অসুবিধা রয়েছে যেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি : এ শক্তির প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ঘণ্টায় কমপক্ষে ৪০০০০ কি.মি. বেগের প্রয়োজন;

খ. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরের মহাশূন্যে বাতাসের অনুপস্থিতি : অথচ এ বাতাস ব্যতীত মানুষের বেঁচে থাকতে পারে না;

গ. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে বিদ্যমান বিপজ্জনক ও মারাত্মক ক্ষতিকর রশ্মিসমূহ, যেমন মহাজাগতিক (cosmic) রশ্মি, অতি বেগুনী (ultra-violet) রশ্মি এবং এক্স-রে বা অজাগ রশ্মি। যখনই মানব দেহ, এমনকি সামান্য পরিমাণে হলেও এসব তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণের শিকার হবে তখনই মানব দেহের ক্ষতিসাধন হবে।

এ সব সমস্যা ও অসুবিধা সত্ত্বেও অবশেষে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা এ সব বাধা দূর করে আসমানসমূহের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সফর করার সামর্থ্য অর্জন করেছে। আর এ বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ যে সম্ভব, তা প্রমাণ করেছে।

৬. যদিও মহানবী (সা.)-এর মে'রাজ অতীতে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মনে হত, তবে বর্তমানকালে মানবজাতি চিন্তাশক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, মে'রাজ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অসম্ভব নয়। কারণ, মানুষ মহাকাশযান নির্মাণ করে উচ্চ গতিবেগ সহকারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং বিশেষ ধরনের পোশাক (নভোচারীর পোশাক) তৈরী করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রশ্মিসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম

হয়েছে। আজকের মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বদৌলতে এমন সব মহাকাশযান নির্মাণ করেছে যেগুলো এক ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যেই পৃথিবীর চারপাশ একবার প্রদক্ষিণ করছে। অথচ একশ বছর পূর্বে যদি কেউ দাবী করত যে, একদিন এ ধরনের কাজ করা সম্ভব হবে, তাহলে জনগণ তাকে পাগল ভাবত এবং সম্ভবত তাকে গ্যালিলিও এর মত ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাত অথবা কারারুদ্ধ করত। উল্লেখ্য, পৃথিবী যে গোলাকার, তা গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন (আর এটাই ছিল তাঁর অপরাধ)।

যখন মানুষ তার সীমিত শক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করে বাহ্যত অসম্ভব কোন কিছুকে সম্ভবে রূপান্তরিত করতে সক্ষম তখন কি মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র অনুমতি নিয়ে এ ধরনের কাজ (মে'রাজ) করতে সক্ষম হবেন না? নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমতা অসীম এবং তার সঙ্গে মানুষের ক্ষমতার কোন তুলনাই হয় না। যেভাবে মহান আল্লাহ্‌ হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠিকে এক বিশাল সাপে পরিণত করেছিলেন, অথচ তা ঐ যুগের মানুষের কাছে অসম্ভব বলে গণ্য ছিল, সেভাবে তিনি মানুষের জন্য অসম্ভব যে কোন অলৌকিক কাজ বাস্তবে সম্ভব করে দিতে পারেন।

৭. সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় যখন অস্তিত্বজগতে শয়তানের অস্তিত্ব এবং সকল মানুষের অন্তরে তার প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা দানের বিষয় মেনে নিয়েছে তখন বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে এ নির্দেশ দেয় যে, মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য হতে বিতাড়িত শয়তানের অকল্পনীয় গতিশক্তি যদি মানুষের কাছে একটি গৃহীত ও স্বীকৃত বিষয় বলে গণ্য হতে পারে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, যিনি মহান আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তাঁর মে'রাজের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা অনুচিত।

ফলাফল

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোকে মে'রাজ সংঘটিত হওয়ার বিষয় মোটেও অসম্ভব নয় যদিও অতীতকালে তা দুঃসাধ্য ও অসম্ভব বলে গণ্য ছিল। সুতরাং যখনই অকাট্য দলিল-প্রমাণাদি দিয়ে মে'রাজ সংঘটিত হওয়া প্রমাণিত হবে তখন সবাই তা মেনেও নেবে। সৌভাগ্যবশত ইসলামী উৎসসমূহে (পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌য়) মে'রাজ সংঘটিত হওয়া সংক্রান্ত অকাট্য দলিল-প্রমাণাদি মুতাওয়াতির সূত্রে বিদ্যমান আছে যে, মহান আল্লাহ্‌ মে'রাজের রাতে মহানবী (সা.)-কে দ্রুতগামী বাহনে করে

আসমানসমূহে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে (মহাকাশ ও মহাশূন্যের বিদ্যমান) যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন।

মেরাজের আকাশের ব্যাখ্যা

মেরাজের ঘটনায় 'আকাশ' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

'আকাশ' বলতে যদি পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানের বিশাল মহাশূন্যকে বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে মেরাজ বলে আর কিছুই বিদ্যমান থাকবে না (অর্থাৎ মেরাজের কথা চিন্তাও করা যাবে না)। আর আকাশ বলতে যদি সূর্যের ও দৃশ্যমান আকাশের ঊর্ধ্বে কোন কিছু বুঝানো হয়ে থাকে যার সপ্তম ছাদের ওপর মহান আল্লাহ অবস্থান করছেন তাহলে এ ধরনের ছাদসমূহের বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই।

উত্তর : পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টিজগতের অন্যতম রহস্য যার স্বরূপ মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এতসব উন্নতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বুঝতে পারে নি। পবিত্র কোরআনের মুফাসসিরগণ 'আকাশ' এর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে এর গুটিকতক আলোচনার দিকে ঈঙ্গিত করব যাতে যে আকাশে মহানবী (সা.) মেরাজের রাতে সফর করেছিলেন তা কোন্ আকাশ ছিল তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এ প্রশ্নটা বাহ্যত মেরাজ সংক্রান্ত নব্য উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব পেতে হলে অত্যাবশ্যকভাবে শুরুতেই আকাশ শব্দের অর্থ, সাত আকাশ এবং ঐ সব আকাশ যেখানে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজেও ভ্রমণ করেছেন সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং রেওয়ায়েতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করব।

'আকাশ' শব্দের অর্থ

সুমূ (سمو) ধাতুমূল থেকে সামা (سماء) শব্দের উৎপত্তি। আর যে কোন জিনিস বা বস্তুর আকাশ বলতে উক্ত বিষয় বা বস্তুর ঊর্ধ্বলোককে বোঝানো হয়। এমনকি

কতিপয় অভিধান রচয়িতার মতে প্রতিটি উচ্চতাই হচ্ছে এর নিম্নের ক্ষেত্রে আকাশ এবং যে কোন নিম্নের অংশই হচ্ছে এর উচ্চ অংশের জন্য জমিন স্বরূপ। ইসলামী বিশ্বকোষে 'আকাশ হচ্ছে একটি বাহ্য গম্বুজ যা পৃথিবীবাসী সব জায়গা থেকে নিজেদের মাথার ওপরে প্রত্যক্ষ করে থাকে'– এ কথা বলার পর প্রখ্যাত অভিধান প্রণেতা ইবনে মানযুর থেকে বর্ণিত হয়েছে আরবী ভাষায় 'আসমান' শব্দের সমার্থক হচ্ছে সামা (سماء) শব্দ অর্থাৎ যা কিছু কোন কিছুর ঊর্ধ্বে থাকবে। যেমন ছাদ অথবা শামিয়ানা– সেটাই হচ্ছে সামা (سماء) ।

আল্লামা তাবারসী মাজমাউল বায়ানে বলেছেন : 'প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, কোন কিছু তোমার ওপরে আছে অথবা আংশিকভাবে হলেও তোমার ওপর ছায়া ফেলে সেটাই হচ্ছে সামা (سماء)। সুতরাং ঘরের সামা (سماء) হচ্ছে ছাদ। মেঘ ও বৃষ্টিকেও সামা (আকাশ) বলা হয়।'

আধুনিক পদার্থ বিদ্যায় 'আকাশ' হচ্ছে অস্তিত্বহীন ও গম্বুজবৎ একটি প্রপঞ্চ যা গ্রহ-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হওয়ার ক্ষেত্র বা পটভূমি স্বরূপ।

সামা (سماء) অর্থাৎ আকাশ শব্দটি পবিত্র কোরআনে একবচন (سماء) ও বহু বচন আকারে (سموات) ৩১০ বারেরও বেশি উল্লিখিত হয়েছে। তবে সবক্ষেত্রেই এ শব্দটি একই অর্থে এবং একই উপমা ও দৃষ্টান্তে ব্যবহার করা হয় নি। সার্বিকভাবে, পবিত্র কোরআনে আকাশ শব্দ পার্থিব ও অবস্তুগত (অজড়)– এ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কতিপয় প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. উচ্চ ও ঊর্ধ্ব অর্থে : এ অর্থ 'আকাশ' (سماء) শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে পূর্ণ সংগতিসম্পন্ন। আর তা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে প্রতিপন্ন হয় :

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

ঐ পবিত্র বরকতময় বৃক্ষের মত যার মূল মাটিতে দৃঢ় প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখাসমূহ আকাশে উন্মুক্ত ও প্রসারিত (হয়ে আছে)।

এ অর্থই সমসাময়িক কালের কতিপয় মুফাস্‌সির উল্লেখ করেছেন; তবে অন্যান্য তাত্ত্বিক আলেম নিম্নোক্ত এ অভিমত পোষণ করেন :

পবিত্র কোরআনে সামা (سماء) শব্দটি 'ঊর্ধ্ব, ওপর ও উঁচু দিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং রূপক অথবা খোলামেলা অর্থাৎ এর চেয়ে আরও ব্যাপক অর্থেও (পবিত্র কোরআনে) ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ, ঊর্ধ্ব, উঁচু বা ওপর (سماء) এর বহুবচন হয় না এবং ওপর বা উঁচু দিক একাধিকও (বহু) হতে পারে না। অথচ সামা (سماء) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই (السموات) (আস-সামাওয়াত) অর্থাৎ বহুবচন আকারে পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সাত আসমান (السموات السبع) উঁচু, ঊর্ধ্ব দিক বা ওপর অর্থে হতে পারে না।

২. ভূপৃষ্ঠ বা পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমণ্ডল অর্থাৎ যে স্থানে মেঘমালা ও বাতাস রয়েছে সেই স্থান :

وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً

এবং আমরা আকাশ থেকে বরকতময় (কল্যাণময়) পানি (বৃষ্টি) অবতীর্ণ করেছি (ভূপৃষ্ঠে)।

৩. গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহের স্থান

تَبَارَكَ الَّذِى جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَ قَمَرًا مُّنِيرً

ঐ সত্তাই হচ্ছেন সুমহান যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

৪. (মহান আল্লাহর) নৈকট্য ও সান্নিধ্য স্থল : যা হচ্ছে গোটা অস্তিত্বজগতের সমুদয় বিষয় পরিচালনা করার স্থান বা কেন্দ্র। কতিপয় মুফাস্‌সির, যেমন আল্লামা তাবাতাবাঈ (রহ) কয়েকটি ক্ষেত্রে সামা শব্দটির এ অর্থ নির্দেশ করেছেন। যে সব আয়াত সামা শব্দের এ অর্থ নির্দেশ করে তন্মধ্যে রয়েছে এ আয়াতটি।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْض

তিনিই (মহান আল্লাহ) আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করছেন।

৫. শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত অস্তিত্বশীল সত্তা : কতিপয় তাত্ত্বিক আলেমের মতে যেমনভাবে আকাশ (সামা) শব্দটি পবিত্র কোরআনে পার্থিব (জগতের) আকাশ অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে, যেমন সাত আকাশ (السموات السبع), তেমনি উচ্চ পর্যায়ের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ () অস্তিত্ব ও অস্তিত্বশীল সত্তা অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই আকাশ (সামা) হচ্ছে জড় জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অজড় আকাশ ও জগৎ এবং এ পার্থিব ও জড় জগতের যাবতীয় অস্তিত্ব উক্ত উচ্চতর (ও শ্রেষ্ঠতর) পর্যায়ে থেকে (নিম্ন জগতে অর্থাৎ জড় পার্থিব জগতে) অবতীর্ণ হয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

(وَ إِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعۡلُومٍ)

প্রতিটি বস্তুর (উপায়-উপকরণের) ভাণ্ডার আমাদের কাছেই বিদ্যমান এবং আমরা সুনির্দিষ্ট পরিমাণেই কেবল তা (এ পার্থিব জগতে) অবতীর্ণ করি।

সুতরাং আভিধানিক অর্থে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পবিত্র কোরআনের ভাষায়ও সামা (আকাশ) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাত আকাশ

পবিত্র কোরআনে মোট আটবার সাত আকাশ (السموات السبع) বাক্যাংশটি বর্ণিত হয়েছে। এই আট স্থানে ব্যবহৃত 'সাত আকাশ' বাক্যাংশটি নিয়ে একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই সাত আকাশ পরস্পর ভিতরে বিদ্যমান, ঠিক যেমন পিঁয়াজের কোয়া সমূহের মত বিন্যস্ত; কারণ, অধিকাংশ মুফাস্সির (طباقا বা ত্বিবাক্বান) শব্দটি পরস্পরের ওপর অবস্থিত স্তরসমূহ বলে অর্থ ও ব্যাখ্যা করেছেন। পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ অনুসারে এ সকল স্তর আসলে গাঢ় (ঘনীভূত) গ্যাস থেকে সৃষ্ট ও গঠিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

(ثُمَّ اسۡتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ)

অতঃপর তিনি (মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করার পর) আকাশসমূহের দিকে (সৃষ্টি করার জন্য) মনোনিবেশ করেন; অথচ তখন সেগুলো (সপ্তাকাশ) ধোঁয়া ও বাষ্প আকারে বিরাজ করছিল। অর্থাৎ মহান আল্লাহ আদি গ্যাস থেকে গ্রহ-নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেন। কারণ, (পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার আগে) ঐ সময় আকাশ (সামা) ধোঁয়া ও ঘনীভূত (গাঢ়) গ্যাস ছিল এবং ধীরে ধীরে তা তরল বা পাতলা হয়ে সাত আকাশে পরিণত হয়। সার্বিকভাবে সাত আকাশ সংক্রান্ত দুটি সম্ভাবনা রয়েছে :

ক. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ

সাত আকাশ বলতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহকেও নির্দেশ করা হয়ে থাকতে পারে। কারণ, পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, আকাশসমূহ হচ্ছে সাতটি এবং সেগুলো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। মহান আল্লাহই সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর মত সাত জমীনও (পৃথিবী) সৃষ্টি করেছেন।

ভূতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহকে এগুলোর বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকলাপ অনুসারে সাত স্তরে বিভক্ত করেছেন :

১. ট্রপোনস্ফেয়ার : ট্রপো শব্দের অর্থ পরিবর্তনশীল এবং স্ফেয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে গোল, বৃত্ত ও অঞ্চল। বিষুব রেখার কাছে অর্থাৎ বিষুবীয় অঞ্চলে এর উচ্চতা ১৬ কি.মি. এবং মেরুতে এর উচ্চতা ১০ কি.মি। বায়ুমণ্ডলের এ অংশেই মেঘমালা গঠিত হয় এবং পৃথিবীর আবহাওয়া সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

২. স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার : এ স্তরটি ট্রপোস্ফেয়ারের ঊর্ধ্ব হতে শুরু হয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩২ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত প্রসারিত। এ অংশে সর্বদা প্রবল ঝড়ো বাতাস বইতে থাকে।

৩. ওজোনোস্ফেয়ার : এ স্তর দ্বিতীয় স্তরের কিছু অংশকেও ধারণ করেছে। এর উচ্চতা ২০ কি.মি. থেকে শুরু হয়ে ৫০ কি.মি. পযর্ন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে এক ধরনের অক্সিজেন আছে যা ওজোন নামে অভিহিত। এই অংশ বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিক উষ্ণ এবং এর উষ্ণতা প্রায় শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি । এর কারণ হচ্ছে এই যে, ওজোন সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে (যার ফলে তা ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারে না)।

৪. মেজোস্ফেয়ার : এ স্তর বা অংশে মহাশূন্য থেকে আগত নভোমণ্ডলীয় জড়পদার্থ বা বস্তুকণাসমূহ তীব্র গতিবেগ থাকার কারণে বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘর্ষণের ফলে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং এগুলোর ভস্ম ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।

৫. আয়োনোস্ফেয়ার : এ স্তরটি এমন এক অঞ্চল যা সত্যিই বিস্ময়কর ও রহস্যময়। বায়ু এ অংশে এতটা পাতলা হয়ে গেছে যে, এ কারণে তা প্রায় বায়ুশূন্যই বলা চলে। ৫০ কি.মি. উচ্চতা থেকে এ অংশের শুরু এবং ঊর্ধ্বে ৩০০ কি.মি. বা ৮০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে কোন জীব বা প্রাণী সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি এবং উল্কাপাত থেকে নিরাপদ ও জীবিত থাকতে সক্ষম নয়। তবে

নভোযানসমূহে যে সব যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো ব্যবহার করে মানুষ বা জীব বায়ুমণ্ডলের এ অংশে নিরাপদ এবং বেঁচে থাকতেও পারবে।

৬. থার্মোস্ফেয়ার : এ অংশে বায়ু-কণাসমূহ বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ বৈদ্যুতিক চার্জ গ্রহণ করে।

৭. এক্সোস্ফেয়ার : এ অংশ বা স্তরে বিদ্যমান কণাসমূহ নিম্নবর্তী স্তরসমূহে বিদ্যমান কণাসমূহের চেয়ে পরিমাণে অনেক কম। আর এ কারণেই এ সব কণা এই স্তরে যেমন দ্রুত গতিতে ছুটে বেড়াতে সক্ষম, তেমনি কিছু কিছু কণা এই স্তর থেকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উপেক্ষা করে বায়ুমণ্ডলের বাইরে চলে যেতেও সক্ষম।

খ. আমাদের দৃষ্টির প্রথম আকাশ ও যেগুলো সংক্রান্ত বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি তথ্য ও জ্ঞান আমাদের নেই

কতিপয় তাত্ত্বিক আলেমের মতে মহানবী (সা.) মেরাজের রাতে যে সাত আকাশ সফর করেছিলেন সেগুলো আসলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ৭ স্তর ছিল না; বরং এ ক্ষেত্রে সাত আকাশ বলতে আমাদের দৃষ্টির প্রথম আকাশ যা সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জ ও তারকাজগতকে শামিল করে তা ছাড়াও আরো এমন ছয় আকাশকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো সংক্রান্ত বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি তথ্য ও জ্ঞান আমাদের নেই। তাঁরা তাঁদের এ দাবী ও বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখান এ বলে : আমরা যদি সাত আকাশ এবং সাত সংখ্যাটি সংখ্যা হিসেবেই গণ্য করি তাহলে এর অর্থ হবে সাত আকাশ। সূরা সাফফাতের ৬ নং আয়াত :

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

'আমরা (পৃথিবীর) নিকটবর্তী আকাশ অর্থাৎ প্রথম আকাশকে গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুশোভিত করেছি'

এবং সূরা ফুসসিলাতের ১২ নং আয়াত :

وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظًا

'আমরা নিম্নবর্তী আকাশকে (তারকা ও নক্ষত্ররাজির) প্রদীপসমূহ দিয়ে সুসজ্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি'– এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আমরা যা দেখি এবং যা মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নাগালে রয়েছে তা সবকিছু প্রথম আকাশের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

আর প্রথম আকাশের এ সব গ্রহ-তারকার পরেও আরো ছয়টি জগৎ বা বিশ্ব আছে যা আমাদের জ্ঞানের নাগালের বাইরে।

এ সব আয়াত থেকে ভালোভাবে বোঝা যায় যে, আমরা যা কিছু দেখি তা অর্থাৎ তারকারাজির জগৎ এসব কিছুই আসলে প্রথম আকাশেরই অংশবিশেষ। আর এ প্রথম আকাশের পরেই আরো ছয় আকাশ রয়েছে যেগুলোর খুঁটিনাটি বিষয় সংক্রান্ত বর্তমানে কোন সূক্ষ্ম তথ্যই আমাদের হাতে নেই। তাই উক্ত ছয় আকাশ আমাদের কাছে অজানা এবং অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে ভবিষ্যতে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, মানুষের অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে তা তত বেশি সৃষ্টিজগতের নতুন নতুন আশ্চর্যজনক বিষয় ও রহস্য উদ্ঘাটন করছে। যা বর্ণনা করা হলো তদনুসারে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব এভাবে দেয়া যায় :

১. মেরাজের রাতে যে আকাশে মহানবী (সা.) উড্ডয়ন করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ ছিল না। আপত্তি তখনই অবধারিত হয়ে যাবে যখন আমরা মহানবী (সা.)-এর মেরাজকে পৃথিবী বা ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহে পরিক্রমণ বলে গণ্য করব। কারণ, মহানবী (সা.) বহু আকাশের অস্তিত্বের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন ও কথা বলেছেন এবং তাঁর কথার বাহ্য অর্থই হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে অবস্থিত বা বিদ্যমান আকাশসমূহ। কতিপয় মুফাস্সির যেমন বিশ্বাস করেন তদনুসারে এ পৃথিবীর আকাশের পরে বা পশ্চাতে আরো ছয় আকাশের অস্তিত্ব রয়েছে।

২. সুউচ্চ আকাশসমূহ এবং সপ্তম আকাশে মহানবী (সা.)-এর উড্ডয়ন সৃষ্টিজগতের অন্যতম রহস্য এবং তাঁর অন্যতম মোজেযা। পবিত্র কোরআনে যে সাত আকাশের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে আমরা কেবল এ পৃথিবীর আকাশকেই দেখি। কিন্তু আমরা জানি না যে, এই আকাশ, পৃথিবী, সৌরজগৎ এবং ছায়াপথসমূহের পশ্চাতে কোন্ কোন্ গ্রহ, নক্ষত্র ও জীব বিদ্যমান। মানুষের জ্ঞান ও তথ্যের এ সীমাবদ্ধতা অন্যান্য আকাশ ও জগৎ যে বিদ্যমান নেই– এ কথার দলিল হতে পারে না।

৩. বর্তমান যুগের মানুষ, সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ও অগ্রগতি সত্ত্বেও নিশ্চিত করে দাবী করতে সক্ষম নয় যে, এই সৌরতন্ত্রে বিদ্যমান গ্রহসমূহেরই সব

বিষয় তারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। তাই দৃশ্যমান এ আকাশ ব্যতীতও যে আরো আকাশের অস্তিত্ব আছে তা কিভাবে অস্বীকার করা যাবে?

ফলাফল

যা আলোচনা করা হলো তা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মেরাজের ঘটনায় বর্ণিত আকাশ বলতে ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ এবং সূর্য ও পৃথিবীর অন্তর্বর্তী সীমাহীন মহাশূন্য বুঝানো হয় নি; বরং আকাশ বলতে আকাশের স্তরসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর মধ্য থেকে আমরা প্রথম আকাশ অর্থাৎ প্রথম বিশ্বের (দুনিয়ার) পদার্থ ও বিষয়াবলী সম্পর্কেই কেবল জ্ঞাত।

মানবজাতি অপরাগতার কারণে এখন পযর্ন্ত আরো ছয় আকাশের নাগাল পায় নি। এ দাবীর সপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত নব নব আবিষ্কার। যে সব বিষয় মানুষ তার চর্মচক্ষু অর্থাৎ জড় দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় সেগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করার অধিকারও তার নেই। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং এই সীমিত ও অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দিয়ে সে অসীমকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

অধিক অধ্যয়নের জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য :

১. সাইয়্যেদ হাশেম রাসূলী মাহাল্লাতী প্রণীত হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনী।
২. শেইখুর রাঈস প্রণীত মে'রাজনামা, রাশ্‌ত, ১৩৫২ (ফার্সী সাল)।
৩. আলী দাওয়ানী প্রণীত ইসলামের ইতিহাস (মহানবী (সা.)-এর জন্মলগ্ন থেকে হিজরী পর্যন্ত)।
৪. সাইয়্যেদ আলী আকবার কোরাইশী প্রণীত পবিত্র কোরআনের অভিধান, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়াহ, তেহরান, (১৩৭১ ফার্সী সাল) কর্তৃক প্রকাশিত।
৫. আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ তাকী মিসবাহ ইয়াযদী প্রণীত মাআরেফে কোরআন (১-৩), ইমাম খোমেইনী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, কোম, (১৩৮৪ ফার্সী সাল) কর্তৃক প্রকাশিত।
৬. আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবাঈ প্রণীত আল-মীযান ফী তাফসীরিল কোরআন, ১৬ ও ১৯তম খণ্ড, দাফতারে তাবলীগাতে ইসলামী, কোম কর্তৃক প্রকাশিত (১৪১৭ হিজরি)।

সৃষ্টিতে 'বাদা' প্রসঙ্গ

আয়াতুল্লাহ আল-উযমা সাইয়্যেদ আবুল কাসেম আল-খুয়ী

- *খোদায়ী অনাদি জ্ঞান আল্লাহর ক্ষমতার পরিপন্থী নয়*
- *আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে ইয়াহুদী দৃষ্টিভঙ্গী*
- *শিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে 'বাদা'*
- *খোদায়ী কাযা'র প্রকারভেদ*
- *বাদা'র প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব ও উপকারিতা*
- *বাদা সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের রেওয়ায়াতসমূহ*
- *মাসুম (আ.) গণের ভবিষ্যদ্বাণীতে 'বাদা'*

'বাদা' সম্পর্কে আলোচনা কেন?

আল্লাহ কর্তৃক শরীয়তের বিধান প্রবর্তন তথা তাশরী'র ক্ষেত্রে যেমন নাসেখ-মানসুখের আলোচনা অপরিহার্য, তদ্রূপ তাঁর সৃষ্টিকার্য তথা তাকউইন'র ক্ষেত্রে বাদা'র আলোচনা অপরিহার্য। তবে আরেকটি কারণে বাদা' প্রসঙ্গে আলোচনা করা জরুরী। তাহচ্ছে এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাব। এমনকি দেখা যায় বাদা'র বিষয়টি সঠিক ভাবে না বুঝতে পেরে এক মাযহাবের আলেমবৃন্দ অন্য মাযহাবের আলেমদের বিভ্রান্ত ও মূর্খ বলে দোষারোপ করেন। অথচ বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হলে শুধু যে বিভিন্ন মাযহাবের আলেমবৃন্দের মধ্যে মতভেদ হ্রাস পেত, তা নয়, উপরুন্ত মহান আল্লাহর প্রতি মারেফাত বৃদ্ধি পেত এবং ঈমানের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হত।

প্রারম্ভিকা

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে গোটা সৃষ্টিজগত মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব ও তাঁরই অসীম ক্ষমতার অধীন। সম্ভব জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর উৎপত্তিই তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তিনি চাইলে কোন জিনিসকে সৃষ্টি করেন আবার না চাইলে তা সৃষ্টি করেন না।

তদ্রূপ এ বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে অনাদিকাল হতে আল্লাহর জ্ঞান সকল সৃষ্টির প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ যা কিছু সৃষ্টিচরাচরে বিরাজমান, তা সবই আল্লাহর অনাদি জ্ঞানে নির্ধারিত। এ 'নির্ধারণ'ই কখনো 'তকদীর' নামে আবার কখনো 'খোদায়ী কাযা' নামে অভিহিত হয়। তবে (এ দিকটির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যে) খোদায়ী তকদীর ও তাবৎ বিশ্বচরাচরের প্রতি মহাপবিত্র আল্লাহর অনাদি জ্ঞান (নির্ধারিত) থাকা, সেগুলোকে সৃষ্টি করার আল্লাহর অসীম ও চিরন্তন ক্ষমতার সাথে কোনরূপ অন্তরায় বা পরিপন্থী হয় না। কারণ যে কোন সম্ভাব্য সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভ সর্বদা আল্লাহর ইচ্ছা প্রযুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতাকে কখনো 'এখতিয়ার' আবার কখনো 'ইচ্ছা' বলা হয়। সুতরাং যদি কোন জিনিস সৃষ্টির জন্য খোদায়ী ইচ্ছা প্রযুক্ত হয় তাহলে তা সৃষ্টি হয়, অন্যথায় সৃষ্টি হয় না। আর প্রত্যেক জিনিসের প্রতি খোদায়ী জ্ঞান সেগুলোর যাবতীয় অবস্থা-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা সহকারেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে, যেমন আল্লাহর সেই ইচ্ছাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে যা ঐ জিনিস সৃষ্টির জন্য প্রযুক্ত হয়। যেহেতু কোন জিনিসের জ্ঞান ও প্রকাশ তার সত্যসার ও বাস্তবতার ওপর অতিরিক্ত কিছু নয়, তাহলে যদি সে সত্যসার ও বাস্তবতা খোদায়ী ইচ্ছার শর্তনির্ভর হয়, তাহলে উক্ত জিনিসের প্রতি জ্ঞানও হবে ঐ খোদায়ী ইচ্ছার শর্তনির্ভরতা সমেত। অন্যথায় প্রকৃত জ্ঞান ও সত্যিকার প্রকাশ হবে না।

অতএব সৃষ্টিসমূহের প্রতি 'খোদায়ী তকদীর ও কাযা'র অর্থ দাঁড়ায় এটা যে, অনাদি কাল থেকেই সকল জিনিসই খোদায়ী জ্ঞানে নির্ধারিত ছিল। আর এই জ্ঞান সৃষ্টিসমূহের বাস্তবতার প্রতিই প্রযুক্ত হয়। আর তাদের বাস্তবতাও খোদায়ী ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের সাথে অবিমিশ্রিত, যা ব্যতীত তারা ঘটে না। খোদায়ী এ ইচ্ছা কল্যাণ ও অকল্যাণ অনুযায়ী পরিবর্তন হয় এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। আর আল্লাহ এ সমস্ত অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং সমস্ত কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে এবং এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টিচরাচরের সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছা প্রযুক্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সম্যক জ্ঞানী।

আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে ইয়াহুদীদের দৃষ্টিভঙ্গী

ইয়াহুদীদের বিশ্বাস, সৃষ্টিচরাচরের ভাগ্য সম্পর্কে অনাদিকালে যে তকদীর ও কাযা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, আল্লাহর ইচ্ছা তার বিপরীতে প্রযুক্ত হওয়া এবং তাকে পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব। একারণে তারা বলে ঃ আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সামনে হাত বাঁধা। কোন কিছু দেওয়া বা ফিরিয়ে নেওয়ার কিম্বা হ্রাস বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখেন না। কারণ এসমস্ত কিছুর উপরই তকদীরের ও অনাদি জ্ঞানের অমোচনীয় কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে। কোনরকম রদবদল সেখানে অসম্ভব।

এখানে তাজ্জবের ব্যাপার হলো ইয়াহুদীরা [আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন] কীভাবে বিশ্বাস করলো যে আল্লাহর হাত বাঁধা এবং তিনি অক্ষম। অথচ তারা মানুষকে স্বাধীন এবং যে কোন কাজ করতে সক্ষম বলে মনে করে। যখন উভয়ের ক্ষেত্রে মাপকাঠি একই জিনিস। তাহল আল্লাহর ও তাঁর বান্দাদের কর্মের প্রতি আল্লাহর অনাদি জ্ঞান প্রযুক্ত হওয়া।

ব্যাখ্যা

যেমনভাবে আল্লাহ্‌র অনাদি জ্ঞান তাঁর নিজের কর্মের প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে, ঐ একই অনাদি জ্ঞান মানুষের কর্মের প্রতিও প্রযুক্ত হয়েছে। কাজেই এই অনাদি জ্ঞান আল্লাহর কর্মের বেলায় যদি তাঁর ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ভিন্ন হয়, তাহলে তা মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতারও ভিন্ন হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় কীভাবে দাবি করা যায় যে অনাদি জ্ঞান আল্লাহর ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার কারণ, কিন্তু মানুষের ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার কারণ নয়!

শিয়া দৃষ্টিতে 'বাদা'

শিয়া আকিদায় ঠিক ইয়াহুদীদের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করা হয় এবং আল্লাহ্‌কে ক্ষমতাবান বলা হয়। তাদের দৃষ্টিতে মহামহিম আল্লাহ সর্বপ্রকার সৃজন ও সৃষ্টির কাজে এমনকি সৃষ্টির মধ্যে ও নির্ধারিত হওয়া বিষয়সমূহে পরিবর্তন ও রদবদল করতে সক্ষম। তাঁর এ কাজকেই 'বাদা' বলা হয়। তবে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তাহচ্ছে, ইমামিয়া শিয়াগণ যে 'বাদা'য় বিশ্বাস করে, তা কেবল সে সমস্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, যেগুলোতে খোদায়ী তকদীর অবশ্যম্ভাবী না থাকে। কিন্তু 'কাযা'র ক্ষেত্রসমূহ এবং অবশ্যম্ভাবী তকদীর হওয়া বিষয়সমূহ পরিবর্তন বা রদবদলযোগ্য নয়। এখানে 'বাদা'র কোন অবকাশ নেই। আর এ জাতীয় ক্ষেত্রগুলোতে খোদায়ী ইচ্ছা ঐ জিনিসেরই উপর প্রযুক্ত হয় যা অবশ্যম্ভাবী 'কাযা' ও 'কাদার' এর ক্ষেত্র বটে। বাদার ক্ষেত্রসমূহ পূর্ণরূপে জানতে হলে খোদায়ী কাযার বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা দরকার।

খোদায়ী কাযার প্রকারসমূহ

এক. ইলমে মাকনুন (গুপ্ত জ্ঞান)

কিছু কিছু খোদায়ী কাযা এরূপ ভাবে রয়েছে যে শুধু আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সে সম্পর্কে অবগত নয়। সে জ্ঞান কেবল আল্লাহর জন্যই স্বতন্ত্র ও নির্দ্দিষ্ট। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে উক্ত গুপ্ত জ্ঞানে 'বাদা' ঘটে না। বরং আহলে বাইত (আ.) হতে অনেক রেওয়ায়াত এসেছে যে 'বাদা' এই জ্ঞান থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে। যেমন :

শেখ সাদুক (রহ.) উয়ুনু আখবারি আর-রিযা (আ.) শীর্ষক গ্রন্থে হাসান ইবনে মুহাম্মদ নওফেলি হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন ঃ ইমাম রেযা (আ.) সুলায়মান মারুযি কে বলেন :

رويت عن أبى عبد الله (ع) إنه قال : إن لله عز وجل علمين : علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو من ذلک يكون البدأ، و علما علمه ملائكته و رسله، فالعلماء من اهل بيت نبيک (نبينا) يعلمونه...

: 'আমার পিতা (তদীয় পিতা) ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর দুটি ইলম রয়েছে : একটি সংরক্ষিত ও গুপ্ত। একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সে জ্ঞান অবগত নয়। আর 'বাদা'র উৎস হচ্ছে ঐ জ্ঞানই। (অর্থাৎ বাদা আল্লাহর ঐ গুপ্ত ও স্বতন্ত্র জ্ঞানের কোন একটি তকদীরে নির্ধারিত)। আরেকটি জ্ঞান হচ্ছে যা তাঁর ফেরেশতাগণ ও নবীগণকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমাদের নবীর (আমাদের নবীর) আহলে বাইতের আলেমগণ (অর্থাৎ মাসুম ইমামগণ)ও তা অবগত।[১]

শেখ মুহাম্মদ হাসান সাফফারও 'বাসায়িরুদ্দারাজাত' গ্রন্থে স্বীয় সনদে আবু বাসির হতে বর্ণনা করেছেন যে ইমাম সাদিক (আ.) বলেন ঃ

ان لله علمين : علم مكنون مخزون لا يعلمه الا هو، من ذلک يكون البدأ، و علم علمه ملائكته و رسله و انبيائه و نحن نعلمه.

: 'আল্লাহর দুইটি জ্ঞান ঃ একটি গুপ্ত ও সংরক্ষিত, যা তিনি ব্যতীত কেউ অবগত নয়। আর বাদা ঐ জ্ঞান থেকেই হয়। আরেকটি জ্ঞান হচ্ছে যা তিনি স্বীয় ফেরেশেতাগণ ও নবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর আমরা (রাসুলের আহলে বাইত)ও তা জানি।'[২]

দুই. অখণ্ডনীয় কাযা

এ হল সেই কাযা, যা সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় নবী ও ফেরেশতাগণকে এমর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে তা অবশ্যই ঘটবে। এ প্রকারের কাযা ও তকদীরের মধ্যেও বাদা কিম্বা পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে উপরোক্ত প্রকারের সাথে এ প্রকারের কাযার পার্থক্য এটা যে, এ প্রকারের কাযা বাদা'র উৎস নয়। তবে প্রথম প্রকারের কাযা হতে বাদা

[১] . উয়ুনু আখবারি আর-রিযা (আ.), খঃ ২, পৃঃ ১৫৯, অধ্যায় ১৩ 'ফি যিকরি মাজলিস আর-রিযা মাআ সুলায়মান আল মারুযি' শিরোনামে, হা ঃ ২

[২] . বাসায়িরুদ্দআরাজাত, খঃ ২, পৃঃ ১০৯, অধ্যায় ২১, হাঃ ১; শেখ কুলায়নী (রহ.)ও এ হাদীসটিকে আবু বাসির হতে বর্ণনা করেছেন। দেখুন : আল-কাফি, খঃ ১, পৃঃ ১৪৭, হা ঃ ৮। তদ্রূপ বিহারুল আনোয়ার, খঃ ৪, পৃঃ ১০৯, অধ্যায় ৩, হাঃ ২৭

উৎসারিত হয়। যেমনটা শেখ সাদুক বর্ণিত পূর্বোক্ত রেওয়ায়াতে ইমাম রেযা (আ.) সুলায়মান মারুযি কে বলেন ঃ

إن عليا (ع) كان يقول : العلم علمان، فعلم علمه الله ملائكته و رسله، فلما علمه ملائكته و رسله فإنه يكون، و لا يكذب نفسه و لا ملائكته و لا رسله و علم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه يقدم منه ما يشاء، و يؤخر ما يشاء و يثبت ما يشاء.

: 'হে সুলায়মান! আলী (আ.) বলতেন, [আল্লাহর] জ্ঞান দু'প্রকারের। এক প্রকারের জ্ঞান যা আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণ ও নবীরাসুলগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তিনি যা তাদেরকে অবগত করেছেন সেটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। কেননা আল্লাহ কখনোই নিজেকে এবং তাঁর ফেরেশতাকুল ও আম্বিয়াকুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন না। [অর্থাৎ তাদেরকে তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন সেটা পরিবর্তন করে তাদেরকে সমাজে মিথ্যুক হিসাবে দাঁড় করান না।] আরেব প্রকারের জ্ঞান যা স্বয়ং তাঁর নিকটেই এবং গুপ্ত রয়েছে। তাঁর কোন সৃষ্টিকেই সে জ্ঞান অবগত করেন নি। ঐ জ্ঞান থেকেই তিনি যা কিছুকে চান এগিয়ে আনেন আবার যা কিছুকে চান পিছিয়ে দেন। তদ্রূপ যা কিছুকে চান মুছে ফেলেন আবার যা কিছুকে চান স্থির রাখেন।'[১]

আয়্যাশী ফুযাইল হতে রেওয়ায়াত করেন যে তিনি বলেন : আমি ইমাম বাকির (আ.) হতে শুনেছি যে তিনি বলেন

من الامور امور محتومة جائية لا محالة ، و من الامور امور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء، و يمحو منها ما يشاء و يثبت ما يشاء، لم يطلع على ذلک احدا – يعنى الموقوفة– فأما ما جاءت به الرسل فهى كائنة لا يكذب نفسه و لا نبيه و لا ملائكته.

:'আল্লাহর তকদীরকৃত কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো অখণ্ডনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী। এ ধরনের তকদীরসমূহ অবশ্যই ঘটবে এবং এর কোন পরিবর্তন বা রদবদল সম্ভব নয় (অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে কোন বাধা ঘটার নয়)। কিন্তু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো আল্লাহর নিকট গুপ্ত ও অনুদ্‌ঘাটিত (অবস্থায়) থাকে, যা সম্পর্কে তিনি কাউকেই অবগত করেন নি। এ ধরনের বিষয়গুলো আগে পরে করা যায়। অর্থাৎ আল্লাহ যেটাকে চান এগিয়ে আনেন এবং স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা সেটাকে মুছে দেন কিম্বা স্থির রাখেন। তবে এ সমস্ত জ্ঞান ও তকদীর হতে তিনি যা কিছু তাঁর নবীগণকে অবগত

[১]. উয়ুনু আখবার আর-রিযা (আ.), খ: ২, পৃ: ১৫৯, অধ্যায় ১৩, হাদিস ১; শেখ কুলায়নি এ হাদিসটিকে ফুযাইল ইবনে ইয়াসার মারফত ইমাম বাকির (আ.) হতে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, দেখুন আল-কাফি , খ: ১, পৃ: ১৪৭, হাদিস ৬

করেছেন সেগুলো অব্যশই সংঘটিত হবে। কারণ আল্লাহ নিজকে ও তাঁর নবীগণ ও ফেরেশতাগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন না।'[১]

তিন. অনবশ্যম্ভাবী কাযা

এ প্রকারের কাযা হচ্ছে সে সমস্ত কাযা, যেগুলো বাইরে ঘটার ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর নবী ও ফেরেশতাকে অবগত করেছেন। তবে এর ঘটনকে স্বীয় ইচ্ছা ও চাওয়ার শর্তাধীন করেছেন। আর এ প্রকারের খোদায়ী তকদীরসমূহেই বাদা ঘটে থাকে।

বাদা'র প্রমাণসমূহ

মহান আল্লাহ এ মর্মে বলেন ঃ يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب

: 'আল্লাহ যা ইচ্ছা তা মুছে ফেলেন এবং যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন এবং তাঁর নিকটেই রয়েছে গ্রন্থের মূল।'[২]

অন্যত্র বলেন ঃ لله الامر من قبل و من بعد : 'অগ্র ও পশ্চাতের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই।'[৩]

অনুরূপ অসংখ্য রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে যা, আল্লাহর অনবশ্যম্ভাবী কাযা ও তকদীরসমূহে বাদা সংঘটিত হওয়ার কথা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

১. তাফসীরে আলী ইবনে ইবরাহিম গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে মুসকান মারফত ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন ঃ

> اذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة و الروح و الكتبة الى سماء الدنيا، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى فى تلك السنة، فاذا اراد الله ان يقدم شيئا ائ يؤخره او ينقص شيئا امر الملك ان يمحو ما يشاء، ثم اثبت الذى اراده، قلت : و كل شيئ هو عند الله يثبت فى كتاب؟ قال : نعم، قلت : فأى شيئ يكون بعده؟ قال : سبحان الله، ثم يحدث الله ايضا ما يشاء تبارک و تعالى.

: 'যখন শবে কদর আসে, তখন ফেরেশতাগণ, রূহ এবং আমল লিপিবদ্ধকারীগণ আসমান হতে জমিনে অবতরণ করেন। তারা (বান্দাদের জন্য) ঐ বছরে খোদায়ী কাযা ও তকদীরসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর আল্লাহ যদি কোন কিছুকে আগে পরে করতে চান কিম্বা কোন কিছু কমবেশি বা পরিবর্তন করতে চান, তাহলে তিনি ফেরশেতাদের নির্দেশ দেন, তখন তারা আল্লাহ যা চান

---

[১]. দ্রঃ কাফি, খঃ ১, পৃঃ ১৪৭. হাদিস ৭
[২]. রা'দ ঃ ৩৯
[৩]. রূম ঃ ৪

সেটাকে তকদীরের পাতা হতে মুছে ফেলে, আর তিনি যা চান সেটা বহাল ও লিপিবদ্ধ রাখে। (আমি) জিজ্ঞেস করলাম ঃ সবকিছুই কি আল্লাহর নিকট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে? তিনি বললেন ঃ জ্বি। আমি আরজ করলাম ঃ তারপরে কি হয়? বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! তারপর মহামহিম আল্লাহ যা চান সেটাই সম্পাদন করেন।'[১]

২. ঐ একই তাফসীর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে মুসকান মারফত ইমাম বাকির, ইমাম সাদিক ও ইমাম রিযা (আলাইহিমুস সালাম) হতে فيها يفرق كل امر حكيم : আয়াতটি[২]র ব্যাখ্যায় এরূপ এসেছে ঃ

> اى يقدر الله كل امر من الحق و من الباطل، و ما يكون فى تلك السنة، و له فيه البداء و المشيئة. يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء من الآجال و الارزاق و البلايا و الاعراض و الامراض، و يزيد فيها ما يشاء و ينقص ما يشاء ...

: 'আল্লাহ সকল বিষয় এবং এক বছরে যা কিছু ঘটবে সেগুলো কদরের রজনীতে তকদীর ও স্থিরিকৃত করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরই অধিকার বাদা ও মাশিয়্যাত (অর্থাৎ যেভাবেই ইচ্ছা করেন সেভাবেই পরিবর্তন ঘটাবার অধিকার তাঁর রয়েছে।) তিনি যা ইচ্ছা আগে আনতে পারেন আবার যা ইচ্ছা পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারেন : আয়ু, রিযিক, বিপদাপদ, রোগব্যধি ইত্যাদি সবই। তদ্রুপ তিনি যা ইচ্ছা বাড়াতে পারেন কিম্বা যা ইচ্ছা কমাতে পারেন... ।'[৩]

৩. 'আল-ইহ্তিজাজ' গ্রন্থে আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন ঃ

> لولا آية فى كتاب الله ، لأخبرتكم بما كان و بما يكون و بما هو كائن الى يوم القيامة ، و هى هذه الآية (يمحو الله ما يشاء...)

: 'কোরআনে যদি একটি আয়াত না থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে এবং (এ যুগে) যা কিছু ঘটবে এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত

---

১. তাফসীরে আলী ইবনে ইবরাহিম, সূরা কদর এর তাফসীর দ্রষ্টব্য। এছাড়াও দেখুন ঃ বিহারুল আনোয়ার, খঃ ৪, পৃঃ ৯৯, অধ্যায় ৩, হাদিস ৯ ; খঃ ৯৭, পৃঃ ১২. অধ্যায় ৫৩, হাদিস ১৮ (অখন্দি প্রিন্ট); খঃ ৯৪, পৃঃ ১২ (বৈরুত প্রিন্ট)

২. দুখান ঃ ৪ 'এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরিকৃত হয়।'

৩. বিহারুল আনোয়ার, খঃ ৪, পৃঃ ১০২, অধ্যায় ১৩

পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা সবই সংবাদ দিতাম। কোরআনের সে আয়াতটি হল : 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মুছে দেন... ।'[১]

শেখ সাদুক (রহ.)ও নিজের দুটি গ্রন্থে (অর্থাৎ আমালি এবং আত-তাওহীদ) স্বীয় সনদে আসবাগ মারফত আমিরুল মুমিনীন (আ.) হতে একই রকম রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

৪. তাফসীরে আয়্যাশি গ্রন্থে যুরারাহ হতে এবং তিনি ইমাম বাকির (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে ইমাম বলেন ঃ

كان على بن الحسين (ع) يقول : لو لا آية فى كتاب الله لحدثتكم بما يكون الى يوم القيامة، فقلت : أية آية ؟ قال : قول الله (يمحو الله ما يشاء...)

:'আলী ইবনুল হুসাইন (আ.) বলতেন ঃ যদি গোটা কোরআনে একটি আয়াত না থাকতো, তাহলে আমি কিয়ামত পর্যন্ত যত ঘটনাই সংঘটিত হবে সে বিষয়ে তোমাদেরকে সংবাদ দিতাম। আমি আরজ করলাম ঃ কোন্ আয়াতটি? বললেন ঃ আল্লাহর বাণী - 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মুছে ফেলেন...'।[২]

৫. কুরবুল আসনাদ গ্রন্থে বাযান্তি হতে এবং তিনি ইমাম রেযা (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে ইমাম বলেন ঃ

قال ابو عبد الله و ابو جعفر و على بن الحسين و الحسين بن على و الحسن بن على و على بن ابى طالب (ع) : لولا آية فى كتاب الله لحدثناكم بما يكون الى ان تقوم الساعة : (يمحو الله ما يشاء.....)

:'ইমাম সাদিক ও ইমাম বাকির ও ইমাম যায়নুল আবেদিন ও ইমাম হুসাইন ও ইমাম হাসান ও আমিরুল মুমিনীন (আলাইহিমুস সালাম) বলেছেন ঃ যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকতো, তাহলে আমরা কিয়ামত অবধি যা কিছুই ঘটবে সবকিছুই তোমাদেরকে বর্ণনা করতাম। সে আয়াতটি হল : 'আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন ... ।'[৩]

এরূপ আরো যেসব রেওয়ায়াত রয়েছে, যেগুলো অনব্যশম্ভাবী কাযা ও শর্তযুক্ত তথা ঝুলন্ত তকদীরসমূহে বাদা সংঘটিত হওয়ার কথা নির্দেশ করে থাকে।

---

১. শেখ তাবারসি, আল ইহ্তিজাজ, পৃ ১৩১, নাজাফের মুর্তাযাভি প্রেস থেকে মুদ্রিত

২. তাফসীরে আয়্যাশী, খঃ ২, পৃঃ ২১৫, হাদিস ২১৫, দেখুন : বিহারুল আনোয়ার, খঃ ৪, পৃ ১১৮, অধ্যায় ৩, হাদিস ৫২

৩. কুরবুল আসনাদ, পৃ: ৩৫৩, হাদিস ১২৬৬

সংক্ষেপে বলা যায়, অবশ্যম্ভাবী কাযা, যাকে 'সংরক্ষিত ফলক', 'মূলগ্রন্থ', 'আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত জ্ঞান' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়, তার মধ্যে বাদা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। আর কীভাবেই বা এতে বাদা'র কল্পনা করা যাবে যখন মহামহিম আল্লাহ অনাদিকাল হতে সবকিছুর বিষয়ে অবগত রয়েছেন এবং কোন কিছুই এমনকি ভূ-মণ্ডলে ও নভঃমণ্ডলে একটি ক্ষুদ্র অণুকণাও তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয় ! (এ মর্মে অসংখ্য রেওয়ায়াত রয়েছে। যেমন ঃ)

শেখ সাদুক 'ইকমালুদ্দিন' গ্রন্থে স্বীয় সনদে আবু বসির ও সামাআ মারফত বর্ণনা করেন যে ইমাম সাদিক (আ.) বলেন ঃ

من زعم ان الله عزوجل يبدو له فى شيئ اليوم لم يعلمه أمس فابرؤوا منه

:'যে ব্যক্তি মনে করে যে, আজ মহান আল্লাহর জন্য কোন জিনিস জানা হয় যা গতকাল তিনি জানতেন না, তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন কর।'[১]

আয়্যাশী, ইবনে সিনান হতে বর্ণনা করেন যে ইমাম সাদিক (আ.) বলেন ঃ

ان الله يقدم ما يشاء، و يؤخر ما يشاء، ويمحو ما يشاء، و يثبت ما يشاء وعنده ام الكتاب، و قال : فكل أمر يريده الله فهو فى علمه قبل أن يصنعه و ليس شيئ يبدو له الا و قد كان فى علمه، ان الله لا يبدو له من جهل.

:'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এগিয়ে আনেন এবং যা ইচ্ছা করেন পিছিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন মুছে ফেলেন এবং যা ইচ্ছা করেন বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকটেই আছে মূলগ্রন্থ। আরো বলেন ঃ সুতরাং আল্লাহ্ যে কাজই করতে চান, তা সম্পাদন করার আগেই তিনি সে ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন। আর কোন সংবাদই তাঁর জন্য প্রকাশিত হয় না এটা ব্যতীত যে তার আগেই তিনি তা জানতেন। আল্লাহর অজ্ঞতা জনিত কারণে কোন জিনিসই তাঁর জন্য প্রকাশিত হয় না।' (অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর জন্য অজানিত ও গুপ্ত নয়)।

অনুরূপভাবে আয়্যাশি আম্মার ইবনে মুসা হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন ঃ ইমাম সাদিক (আ.) এর নিকট (يمحو الله...) এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। উত্তরে ইমাম বললেন ঃ

ان ذلک الكتاب كتاب يمحو الله ما يشاء و يثبت، فمن ذلک الذى يرد الدعاء القضاء و ذلک الدعاء مكتوب عليه الذى يرد به القضاء، حتى اذا صار الى ام الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئا

[১]. ইক্মালুদ্দীন, পৃঃ ৭০

: 'নিশ্চয় এ গ্রন্থটি হচ্ছে সেই গ্রন্থ, যা থেকে আল্লাহ যাকিছু ইচ্ছা করেন মুছে ফেলেন এবং যাকিছু ইচ্ছা করেন বহাল রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে কাযা ও ভাগ্যপরিণতি অপসারিত হওয়া ঐ গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই শ্রেণীভুক্ত। আর তার উপরেই দোয়া লেখা হয়েছে যে তদ্বারা খোদায়ী 'কাযা' ও 'কাদার' পরিবর্তন হয়। কিন্তু যদি ঐ কাযা ও কাদার উম্মুল কিতাব তথা মূলগ্রন্থে লিখিত হয় এবং নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন আর দোয়া তা পরিবর্তনে কোন ফল দেয় না।'[১]

শেখ তুসি (রহ) 'আল-গায়বাহ্' নামক গ্রন্থে বাযান্তি মারফত ইমাম রেযা (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ

قال على بن الحسين (ع) و على بن ابى طالب قبله، و محمد بن على و جعفر بن محمد (ع) : كيف لنا بالحديث مع هذه الآية : (يمحو الله...) فأما من قال : بأن الله تعالى لا يعلم الشيئ الا بعد كونه فقد كفر و خرج عن التوحيد.

: 'আলী ইবনে হুসাইন (আ.) এবং তাঁর পূর্বে আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ও ইমাম বাকির ও ইমাম সাদিক (আ.) বলতেন ঃ কীভাবে আমরা (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মুছে ফেলেন...) এ আয়াতের উপস্থিতিতে ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করতে পারি ! (অর্থাৎ কিছু কিছু খোদায়ী কাযা ও তাকদীর যেহেতু পরিবর্তনযোগ্য এবং তাতে বাদা সংঘটিত হওয়ার সুযোগ থাকে, সেহেতু আমরা ভবিষ্যত সম্পর্কে অকাট্টভাবে সংবাদ প্রদান করতে পারি না।) কিন্তু কেউ যদি এমন ধারণা পোষণ করে যে পরিবর্তন ঘটা ও বাদা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে আল্লাহ্ কোন জিনিসের প্রতিই জ্ঞান রাখেন না, যতক্ষণ না তা সংঘটিত হয়; তাহলে এরূপ ধারণাকারী কাফের এবং তাওহীদের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে।'[২]

আহলে বাইত (আ.) হতে বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ[৩], যেগুলো নির্দেশ করে যে আল্লাহ অনাদিকাল থেকে এবং সৃষ্টিসমূহের সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই তাদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন, এরূপ রেওয়ায়াতের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। ইমামিয়া শিয়াগণ পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ ও রাসুলূল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ (এবং রেওয়ায়াত) মোতাবেক এবং বিশুদ্ধ সহজাত বুদ্ধিবৃত্তির নির্দেশের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একমত পোষণ করে থাকে।

'বাদা' ও প্রতি বিশ্বাসের উপকারিতা ও প্রভাবসমূহ

১. তাফসীরে আয়্যাশী, খঃ ২, পৃঃ ২২০, হাদিস ৭৪
২. কিতাবুল গায়বাহ, পৃঃ ৪৩০, হাদিস ৪২০
৩. কাফি, খঃ ১, পৃঃ ১০৮, হাদিস ৬ ও খঃ ১, পৃঃ ১৪৮, হাদিস ১১ ..ইত্যাদি

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে বাদা কেবলমাত্র শর্তাধীন ও ঝুলন্ত কাযাসমূহের বেলায় ঘটে থাকে। একে 'লওহে মাহু ওয়া ইস্‌বাত' বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র অনবশ্যম্ভাবী কাযাসমূহের ক্ষেত্রে বাদা'র বিশ্বাস আল্লাহকে অজ্ঞ বলার যেমন কারণ হয় না, তেমনি তা মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তার মহত্ত্ব ও মহিমার সাথে পরিপন্থীও নয়।

সুতরাং বাদা সংঘটিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখার অর্থ হয় এটা যে, আমরা স্বীকার করি, জগত উৎপত্তি তথা সৃষ্টির দিক দিয়েও যেমন মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধীন, তদ্রূপ তা চলমান ও টিকে থাকার দিক দিয়েও মহান আল্লাহর ক্ষমতার অধীন। আর এটাও স্বীকার করি যে অনাদি থেকে অনন্তকাল ধরে জগতের সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ই কার্যকর।

বাদা'য় বিশ্বাসের মাধ্যমে স্রষ্টার জ্ঞান ও সৃষ্টির জ্ঞানের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। সৃষ্টির জ্ঞান (এমনকি যদি নবী কিম্বা ইমামও হয়ে থাকেন) স্রষ্টার জ্ঞানের ব্যাপ্তির ধারে কাছেও নয়। তারা আল্লাহ্‌র ন্যায় সবকিছুর জ্ঞান আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হয় না। কারণ যদিও বা কতেক সৃষ্টি মহাপ্রতিপালকের শিক্ষাধন্য হয়ে গোটা সম্ভবপর জগতসমূহের প্রতি অবগতি লাভ করেও, কিন্তু তবুও আল্লাহর ঐ সংরক্ষিত ও গুপ্ত জ্ঞানভাণ্ডারের নাগাল পাবেই না। কারণ তা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই স্বতন্ত্র। যদি না আল্লাহ্‌ কোন কিছু অবশ্যম্ভাবী ঘটার ব্যাপারে কাউকে অবগত করে থাকেন এবং তাকে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়ে দিয়ে থাকেন, যা বাদা বিমুক্ত। (কিন্তু আল্লাহ্‌র উক্ত সংরক্ষিত ও গুপ্ত জ্ঞান, যা তিনি কাউকেই শিক্ষা দেন না, তা সেভাবেই আল্লাহর মহান সত্ত্বার জন্যই নিদ্দিষ্ট ও নির্ধারিত থাকে। কেউই তা অবগত হতে পারে না।)

বাদা'য় বিশ্বাস রাখার তৃতীয় উপকারটি হচ্ছে , এ বিশ্বাস মানুষকে সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিড় মনোযোগী করে তোলে। সে আল্লাহ্‌র দরবারের অভিমুখি হয় এবং তাঁরই সহায়তা কামনা করে। আর তাঁর নিকট আনুগত্য করা এবং পাপ থেকে দুরে থাকার তওফিক চায় (যাতে চিরকালীন সৌভাগ্য ও মহা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।)

অবশ্য কেউ যদি বাদা অস্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে তকদীরের অমোচনীয় কলম দ্বারা যা লিখিত ও স্থির হয়ে গেছে তা কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই অকাট্ট ও অলঙ্ঘনীয়ভাবে সংঘটিত হবেই, কোন পরিবর্তন তাতে সম্ভব নয়; তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এরূপ ব্যক্তির পক্ষে বিপদ আপদ দূর করার নিমিত্তে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে দোয়া মোনাজাত করার কোন অর্থই থাকবে না। কারণ, এহেন চিন্তা বিশ্বাসের ফলে তখন দোয়া মোনাজাত কবুল হওয়ার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে হতাশা

ও নিরাশা ভর করবে। সে তখন এরূপ বন্দেগী ও কর্মসমূহকে অনর্থক ও অকারণ বলে মনে করতে থাকবে। কেননা, সে যেহেতু বাদা'য় বিশ্বাসী নয়, একারণে সে যেটা তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে, সেটা যদি অমোচনীয় কলমে লেখা হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যম্ভাবী ঘটবেই ঘটবে। সেক্ষেত্রে দোয়া মোনাজাতের কোন প্রয়োজন নেই। আবার অমোচনীয় কলম দ্বারা যদি এর বিপরীত লেখা হয়ে থাকে, তাহলে তা কোনরূপেই সংঘটিত হবে না। সেক্ষেত্রে মানুষের দোয়া বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলবে না। এভাবে মানুষ যদি তার দোয়া মোনাজাত কবুল হওয়ার বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে তাহলে সে আর আল্লাহর দরবারে অনুনয় বিনয় ও ক্রন্দন করবে না। কেননা তার দৃষ্টিতে এতে কোন লাভ নেই। এই একই কথা তার অন্যান্য ইবাদতকর্ম ও দান-সদ্‌কার বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। যে দান-সদ্‌কা সম্পর্কে মাসুম ইমামগণ (আ.) থেকে রেওয়ায়াত এসেছে যে তা আয়ু বৃদ্ধি, রুজি রোজগারে বরকত আর পরিণাম শুভ হওয়ার কারণ হয়। এজন্যই আহলে বাইত (আ.) এর রেওয়ায়াতসমূহে বাদা সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শেখ সাদুক আত-তাওহীদ গ্রন্থে স্বীয় সনদে যুরারাহ (ইমাম বাকির ও ইমাম সাদিক আ. এর বিখ্যাত সাহাবী) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন : ما عبد الله بشيئ مثل البدأ : "আল্লাহ্ বাদা'র ন্যায় অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে এতটা উপাসিত হননি।"[১]

অনুরূপভাবে স্বীয় সনদে হিশাম ইবনে সালিম মারফত ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ ما عظم الله عز وجل بمثل البدأ ঃ "আল্লাহ্ বাদা'র মত অন্য কিছু দ্বারা এতটা তা'যিম (মহিমান্বিত) হননি।"[২]

একইভাবে স্বীয় সনদে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম মারফত ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন ঃ

ما بعث الله عزوجل نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال : الإقرار بالعبودية و خلع الأنداد و أن الله يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء.

: 'মহামহিম আল্লাহ কোন নবীকেই তার কাছ থেকে তিনটি বিষয়ে স্বীকারোক্তি গ্রহণ ব্যতীত প্রেরণ করেননি : বন্দেগীর স্বীকারোক্তি, শির্‌ক মুক্ত থাকা আর এটা যে, নিশ্চয় আল্লাহ যা চান এগিয়ে আনেন এবং যা চান পিছিয়ে দেন।'[৩]

---

১. আত-তাওহীদ, পৃ ঃ ৩৩১-৩৩৩, অধ্যায় ৫৪, হাদিস ১; আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এরূপ এসেছে : **ما عبد الله عز وجل بشيئ افضل من البدأ :** মহামহিম আল্লাহ বাদা এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন কিছু দ্বারা উপাসিত হননি। কাফি, খঃ ১, পৃঃ ১৪৬, হাদিস ১

২. আত-তাওহীদ, পৃঃ ৩৩৩, অধ্যায় ৫৪, হাদিস ২ ও ৩; কাফি, খঃ ১, পৃঃ ১৪৭, হাদিস ৩

৩. প্রাগুক্ত

মাসুম ইমামগণ (আ.) বাদা'র উপর এত গুরুত্বারোপ করেছেন, কারণ বাদা অস্বীকার করা আর আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকে অস্বীকার করা একসমান। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাযা ও তকদীরের কলম দ্বার যা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। না পারেন কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে আর না পারেন আগ্-পিছ করতে। تعالى الله عن ذلک علوا کبیرا : আল্লাহ এহেন অক্ষমতা থেকে বিমুক্ত, উর্দ্ধে শান। আর এ বিশ্বাসদ্বয় (অর্থাৎ বাদা অস্বীকার করা ও আল্লাহ্‌র ক্ষমতা অস্বীকার করা) উভয়ই মানুষের স্বীয় ভাগ্য পরিবর্তনে দোয়া ও কাকতি-মিনতির প্রভাব তথা কার্যকারিতার ব্যাপারে হাতাশা ও নিরাশার কারণ হয়। ফলে এরূপ ব্যক্তি কখনোই এমনকি বিপদ আপদে আক্রান্ত অবস্থায়ও খোদায়ী পবিত্র সত্তার প্রতি মনোযোগ দিবে না, তাঁর নিকট কোন সাহায্যও চাইবে না। এভাবে সে খোদায়ী কৃপা হতে বঞ্চিত হবে।

শিয়া দৃষ্টিতে বাদা এবং বাদা সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের রেওয়ায়াতসমূহ

এ পর্যন্ত আমরা এ ফলাফলে উপনীত হয়েছি যে ইমামিয়া শিয়াদের নিকট বাদা বলতে বোঝায় 'প্রকাশ করা'। (অর্থাৎ আল্লাহ্ যে জিনিস মানুষের নিকট অজানা ও অস্পষ্ট ছিল, তা প্রকাশ করে দেন।) সুতরাং আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে বাদা শব্দটির প্রয়োগ নিছক রূপক। আর (بدا الله) কথাটির অর্থ 'আল্লাহর জন্য প্রকাশিত হওয়া' নয়। বরং এর অর্থ হল 'আল্লাহ প্রকাশিত করলেন'। এ রূপকীয় প্রয়োগের উপলক্ষ এটা যে ঐ সত্যটি আমাদের (অর্থাৎ মানুষদের) জন্য প্রকাশিত ও উদ্‌ঘাটিত হয়।

আহলে সুন্নাত সূত্রে বর্ণিত কতেক রেওয়ায়াতে এ অর্থেই বাদা'র কথা এসেছে। যেমন ঃ ইমাম বুখারী স্বীয় সনদে আবু ওমরাহ হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন ঃ আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) হতে শুনেছি যে তিনি বলতেন ঃ

ان ثلاثة فی بنی اسرائیل : أبرص و أعمی و أقرع. بدا الله عزوجل أن یبتلیهم فبعث الیهم ملکا فأتی الابرص ...

: 'বনি ইসরাঈলের মধ্যে তিন জন লোক ছিল, যাদেরকে আল্লাহ রোগাক্রান্ত করলেন , একজনকে শ্বেতীরোগে, আরেক জনকে অন্ধ এবং অপর জনকে টাকপড়া রোগে। আল্লাহর জন্য বাদা হল যে তাদেরকে পরীক্ষা করবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একজন ফেরেশতাকে তাদের নিকট প্রেরণ করলেন এবং উক্ত ফেরেশতা যে লোকটির শ্বেতী রোগ ছিল তার নিকট গেল...।'[১]

---

১. সহীহ বুখারী, খঃ ৪, পৃঃ ১৪৬, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, বনি ইসরাঈলের হাদীসমূহ অধ্যায়, হাদিস ৩২০৫; সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকায়িক, হাদিস ৫২৬৫

[এখানে উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাদের অবস্থাকে তাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যান্যদের জন্য প্রকাশিত করতে চাইলেন। তা নাহলে, আল্লাহ যিনি (و هو بكل شيئ محيط) সমস্ত কিছুর ওপর সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত এবং সবকিছুর প্রকাশকারী, তাঁর নিকট কোন কিছু অজানা বা গোপন থাকবে, আর তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে তা জ্ঞাত হতে চাইবেন কিম্বা তাঁর নিকট সেটা প্রকাশিত হবে, এটা কখনো হতে পারে না।]

এই একইরূপ রূপকীয় প্রয়োগ পবিত্র কোরআনেও অনেক এসেছে। উদাহরণস্বরূপ (الآن علم الله ان فيكم ضعفا) 'এখন আল্লাহ্ জানতে পারলেন যে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।'[১]

তদ্রূপ এ আয়াতটি : لنعلم اى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ... :'অতপর তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে জানতে পারি যে ঐ দু'দলের মধ্যে কোন দলটি তাদের অবস্থানের সময়কালকে উত্তমভাবে হিসাব করেছে।'[২]

আরেকটি আয়াত : لنبلوهم ايهم احسن عملا ... : 'যাতে আমি পরীক্ষা করে দেখতে পারি কে তাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী।'[৩]

আহলে সুন্নাতেরও প্রচুর রেওয়ায়াতে এসেছে যে, সদ্কা ও দোয়া খোদায়ী কাযা ও মানুষের ভাগ্য বদলে দেয়।[৪]

অতএব তিন প্রকার কাযা রয়েছে। ইতোপূর্বে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তার আলোকে আপনি জানতে পেরেছেন যে এধরনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে ক্ষুদ্রতম কোন পরিবর্তন তথা বাদা'র সুযোগ নেই। বরং ঐ সব ঘটনা ঠিক যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেভাবেই সংঘটিত হবে। কারণ, আল্লাহ্ মাসুমের মাধ্যমে মানুষকে যা প্রচার করেছেন, তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে এবং তাঁর সত্যবাদী বান্দাগণ (আম্বিয়া ও মাসুমগণ) কে জনমানুষের মাঝে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করবেন না।

মাসুমগণের (আ.) ভবিষ্যদ্বাণীতে বাদা

যখন কোন একজন মাসুম (আ.) কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সংবাদ দেন, কিন্তু সেটাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত করেন, আর নিজের বক্তব্যে উক্ত শর্তের

---

১. আনফাল ঃ ৬৬

২. কাহ্ফ ঃ ১২

৩. কাহ্ফ ঃ ৭

৪. যেমন সুলায়মান বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : لا يرد القضاء الا الدعاء و لا يزيد فى العمر الا البر: কোন কিছুই খোদায়ী কাযা'কে দূর করতে পারে না, দোয়া ব্যতীত। আর কোন কিছুই মানুষের আয়ুকে বৃদ্ধি করতে পারে না, পরোপকার ও পুণ্যের কাজ ব্যতীত। দ্রঃ 'সুনানে তিরমিযী, খঃ ৮, পৃঃ ৩৫০, হাদিস ৩০৬৫, অধ্যায় লা ইউরাদ্দু আল কাযা ইল্লা আদ-দুআ'

উপর বিভিন্ন সাক্ষ্য ও আলামতচিহ্ন ব্যবহার করেন, এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোই বাদার আওতায় পড়ে এবং এরূপ খোদায়ী কাযা'র মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। (এটা তৃতীয় প্রকারের খোদায়ী কাযা'র অন্তর্ভুক্ত)। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর বিপরীতে প্রযুক্ত হয় এবং মাসুম (আ.) যা সংবাদ দিয়েছেন তা না ঘটে, সেক্ষেত্রে (সাধারণের দৃষ্টিতে) এটা মিথ্যা বলে গণ্য হবে না। বরং ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক। তবে আল্লাহ চাননি তা ঘটুক। কারণ অনাদিকাল হতে তা ঘটার জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও চাওয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। যেন আল্লাহর ইচ্ছা তার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়।

আয়্যাশী আমর ইবনুল হাম্‌ক হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেন :

دخلت على امير المؤمنين (ع) حين ضرب على قرنه فقال لى : يا عمرو ! انى مفارقكم ثم قال : سنة السبعين فيها بلاء. فقلت : بأبى انت و امى ! قلت : الى السبعين بلاء فهل بعد السبعين رخاء؟ قال : نعم، يا عمرو! ان بعد البلاء رخاء... و ذكر آية (يمحو الله ما يشاء..)

: 'আমি আমিরুল মুমিনীন (আ.) তলোয়ারের আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আমর! আমি অচিরেই তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। অতঃপর বললেন ঃ সত্তর বছরে বিপদ রয়েছে। আমি আরজ করলাম ঃ আমার পিতামাত আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আপনি বললেন সত্তর বছর পর্যন্ত বিপদ রয়েছে। তাহলে কি সত্তর বছরের পর মুক্তি হবে? তিনি বললেন ঃ জ্বি, হে আমর! ঐ বিপদের পর মুক্তি রয়েছে। তখন তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন : 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মুছে দেন...'।[১]

ভাষান্তর ঃ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

[১]. তাফসীরে আয়্যাশী, খঃ ২ , পৃ ঃ ২১৭, হাদিস ৬৮

শহীদ আয়তুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহহারীর দর্শনচিন্তায়

মানব জীবনে ধর্মের অবদান

সংকলনে : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মানুষ সবচেয়ে শক্তিশালী একারণে যে তার বুদ্ধি রয়েছে। এ বুদ্ধি দ্বারা সে চিন্তা করতে পারে, উদ্ভাবন করতে পারে, পরিকল্পনা করতে পারে। সুতরাং মানুষের জীবনে চিন্তা ও বুদ্ধির যে অশেষ অবদান রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। বন্ধু নির্বাচন, পড়াশুনার সাবজেক্ট নির্ধারণ, স্ত্রী নির্বাচন, পেশা নির্বাচন, ভ্রমণ, মেলামেশা, বিনোদন, পরোপকারমূলক কাজ, বক্রগামিতা ও ভ্রান্তিচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই চিন্তা, বুদ্ধি ও পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে নিঃসন্দেহে। বরং যতবেশি চিন্তা ও পরিকরল্পনা করা যাবে ততবেশি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে। কখনো কখনো আবার অপরের কাছ থেকে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। একারণে পরামর্শ করে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত এসব বিচ্ছিন্ন বিষয়ে মানুষ পরিকল্পনা তৈরি করে এবং তা বাস্তবায়নে ব্রতী হয়।

এখন প্রশ্ন হল জীবনের এসব বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন (individual) বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে যদি মানুষকে চিন্তা, পরিকল্পনা ও পরামর্শ করে অগ্রসর হতে হয় তাহলে সার্বিক ও সামগ্রিক (universal) বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে করণীয় কি?

মানুষ কি এমন কোন চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম যা তার ব্যক্তি জীবনের সকল সমস্যা নিরসন করবে এবং তার সমস্ত কল্যাণ নিশ্চিত করবে? নাকি শুধু বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ কিছু বিষয়েই চিন্তা ও পরিকল্পনা করতে সক্ষম, আর জীবনের সার্বিক দিকের সামষ্টিক কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বিষয়ে চিন্তা ও পরিকল্পনা করা তার বুদ্ধিসীমার অতীত?

আমরা জানি যে কোন কোন দার্শনিক এরূপ স্বাবলম্বী ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। তারা দাবি করতেন যে জীবনের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পথ আমরা আবিস্কার করে ফেলেছি। আমরা স্বীয় বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করে নিজেদেরকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করতে সক্ষম। আবার অপরদিকে এটাও আমরা জানি যে দুনিয়ায় দুজন দার্শনিককে খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা এ পথ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করে থাকেন। স্বয়ং 'সৌভাগ্য' কথাটি যা চুড়ান্ত লক্ষ্য এবং যাকে অর্জন করার জন্য সমস্ত চেষ্টা ও প্রয়াস, সেটাই সবচেয়ে অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত রয়ে গেছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটি স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। সৌভাগ্য কি? কীভাবে তা লাভ করা যায় ? আর দুর্ভাগ্যই বা কি এবং তার কারণসমূহ কি কি? এ বিষয়গুলো আজও অজানা ও অচেনা রয়ে গেছে? কেননা আজও অবধি মানুষ নিজেই তার শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতাগুলো সম্পর্কে জানতে পারেনি। তাই যেখানে মানুষ নিজে অজ্ঞাত থাকে সেখানে কি তার সৌভাগ্য কিসে এবং কোন পথে তা অর্জন সম্ভব সে কথা জানা সম্ভবপর ? তার চেয়েও বড় কথা হল মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী। আর সামাজিক জীবন মানেই তাকে হাজার রকমের সমস্যা ও সংকটের সম্মুখিন হতে হবে। তাকে সেগুলোর সমাধান পেতে হবে এবং স্বীয় কর্তব্য স্থির করতে হবে। আর যেহেতু সমাজবদ্ধ হয়েই তাকে চলতে হয় একারণে তার সৌভাগ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাল-মন্দের মানদণ্ড, তার পথ ও পন্থা এবং উপায় পদ্ধতি নির্বাচন অন্যদের সৌভাগ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাল-মন্দের মানদণ্ড, তাদের পথ ও পন্থা এবং উপায় পদ্ধতি নির্বাচনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একারণে সে নিজের পথকে অন্যদের থেকে আলাদা করে বেছে নিতে পারে না। বরং তার নিজের সৌভাগ্যকে তাকে সেই মহাসড়কে খুঁজে বেড়াতে হবে যে মহাসড়ক গোটা সমাজকে সৌভাগ্য ও কল্যাণে পৌঁছে দেয়।

আমরা যদি জীবনের অনন্ততা ও আত্মার অমরত্ব আর দুনিয়া পরবর্তী জগত সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিক্ষমতার অনভিজ্ঞতার কথা এর সাথে যোগ করি তাহলে সমস্যা আরো প্রকট রূপ ধারণ করবে। তখন মানব জীবনে একটি আদর্শ তথা আইডোলজির অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন হবে সন্দেহাতীতভাবে। এমন এক আইডোলজি যা একটি সামগ্রিক তত্ত্ব-দর্শন, একটি সর্বব্যাপী, সুসমঞ্জস ও সুসমন্বিত পরিকল্পনা, যার মূল লক্ষ্য মানুষের পূর্ণতা ও সার্বজনীন সৌভাগ্য সাধন। স্বভাবতই তাতে মূল নীতিপন্থাসমূহ, ঔচিত্য অনৌচিত্যসমূহ, ভাল বা মন্দসমূহ, লক্ষ্য ও উপায়সমূহ,

চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহ এবং সেগুলোর পূরণের ব্যবস্থা আর দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বিশদভাবে সুবর্ণিত ও সুনির্দ্দিষ্ট থাকবে। আর এ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ প্রত্যেক ব্যক্তি মানবকেই আহ্বান করবে।

মানুষ সেই সূচনালগ্ন থেকে কিম্বা নিদেনপক্ষে যখন থেকে তার সামাজিক জীবন বিকাশ লাভ করে যার সূত্র ধরে সে একশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-বিভেদে আক্রান্ত হয়েছে, তখন থেকেই তার একটি আইডোলজি বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পবিত্র কোরআনের ভাষায় যাকে বলা যায় 'শরীয়াত'। তারপর সময যতই গড়িয়েছে এবং মানুষ যতই বিকশিত ও পূর্ণতর হয়েছে এ প্রয়োজনও ততটা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ লাভ করেছে। আজকের মানুষ যে জিনিসটি দ্বারা সর্বাগ্রে আগামীকালের মানুষের জন্য একতা ও দিক-নির্দেশনা দান করতে এবং অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে চালিত করতে পারে যা ভবিষ্যতের মানুষের সামনে ভাল-মন্দ আর উচিত-অনুচিতের মানদণ্ডে পরিণত হতে পারে, সে জিনিসটি অন্য কিছু নয়, শুধুমাত্র জ্ঞাতসারে নির্বাচন করা একটি যুক্তিগ্রাহ্য কল্যাণমুখি জীবন দর্শন। অন্যভাষায় বলা যায় একটি সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ আইডোলজি। এরূপ একটি জীবন দর্শনের প্রতি বিগত দিনের মানুষের চেয়ে আজকের মানুষের আরো বেশি প্রয়োজন। যে দর্শন তাকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে ও ব্যক্তির উর্দ্ধে সত্যসমূহের প্রতি আসক্ত করে তুলতে সক্ষম হবে। আজ এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে সামাজিক জীবনে আইডোলজি তথা সু-আদর্শ একটি অপরিহার্য বিষয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এরূপ এক আইডোলজি বা এরূপ এক সু-আদর্শ প্রণয়ন ও প্রবর্তন করার সাধ্য কার আছে? ব্যক্তি মানুষের বুদ্ধি সক্ষম নয়, সামষ্টিক বুদ্ধি কি সক্ষম? মানুষ কি তার সম্মিলিত জ্ঞান আর অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতাগুলো একত্রে মিলিয়ে এরূপ আদর্শ প্রণয়ণ করতে পারে? আমরা যদি স্বয়ং মানুষকেই তার নিজের জন্য বড় অজানা ও অজ্ঞাত বলে মনে করি তাহলে মনুষ্য সমাজ ও সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি যে আরো অজানা ও অজ্ঞাত হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই বাস্তবতার নীরিখে দাঁড়িয়ে আমরা যদি জগত ও জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টির অধিকারী থাকি, বিদ্যমান জাগতিক ব্যবস্থাকে সুসমঞ্জস ও ভারসামপূর্ণ বলে মেনে নিই এবং সৃষ্টিক্রিয়ায় কোন রকম ঘাটতি বা অনর্থক কর্মকে নাকচ করে দিই তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে মহান সৃষ্টিকর্তা এ বৃহত্তম প্রয়োজনটিকে অপূর্ণ

রাখেননি। তিনি মানুষের বুদ্ধিমত্তার উর্দ্ধমহল অর্থাৎ প্রত্যাদেশ জগত থেকে এ মহাসড়কের মূল রূপকল্প নির্ধারণ করে দিয়েছেন (নবুওয়াত তত্ত্ব)। আর বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের কাজ হল এ রূপকল্পের অভিযাত্রা করা।

ধর্ম মানুষের চাওয়া পূরণকারী

ধর্ম মানুষের চাওয়াকে পূরণ করে। এর কোন বিকল্পও নেই। এক সময় মনে করা হত যদি সভ্যতা উন্নত হয় তাহলে ধর্মের আর কোন স্থান থাকবে না। অথচ আজ প্রমাণিত হয়েছে একটি সুন্দর জীবনের জন্য ধর্মের প্রতি মানুষের যে প্রয়োজন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি তা মেটাতে সক্ষম নয়। মানুষের ব্যক্তিগত দিক দিয়েও যেমন ধর্মের প্রতি মুখাপেক্ষি, সামাজিক দিক থেকেও তেমনি ধর্মের প্রতি মুখাপেক্ষি। এই যেটুকই অনাদি অনন্তের ভাবনা মানুষের চিন্তায় জেগে ওঠে তাতেই তার মনে প্রাণে অনন্তের প্রতি আবেগ, বাসনা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে এহেন বিস্তৃত বিশাল কল্পণার উদয় এবং এহেন মহা ব্যাপক ও সুবিস্তৃত নেশার উৎপত্তি তার ক্ষুদ্র নশ্বর দৈহিক গড়ন কাঠামোর সাথে কোনক্রমেই সামঞ্জস্যশীল নয়। অর্থাৎ যখন একদিক থেকে নিজের মধ্যে ঐ বিশালায়তন কল্পনা ও নেশা অনুভব করে আর অপরদিক থেকে নিজের ক্ষুদ্রাকৃতির সীমাবদ্ধ ও নশ্বর দেহবস্তুর দিকে তাকায় তখন সে দেখতে পায় এমন এক লোক্‌মার প্রতি তার আসক্তি জন্মেছে যা তার মুখের তুলনায় বিশাল বড়। কিম্বা এমন এক টুপি মাথায় পরার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে যা শুধু তার মাথার জন্যই নয়, গোটা দুনিয়া জাহানের জন্যও বড় হয়ে যাবে। এমনই এক বাস্তবতায় মানুষের বাসনা ও নেশাসমূহ আর তার দৈহিক সামর্থের মধ্যে এক অদ্ভুত ও পীড়াদায়ক অসঙ্গতি দেখতে পায়। অনন্তের থেকে বঞ্চনার যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে। ঐসব জীববস্তুর দিকে লক্ষ্য করে আর আফসোসে মরতে থাকে যেগুলোর চিন্তাসীমা তাদের দৈহিক সামর্থ সীমার সাথে সঙ্গতিশীল। ওরা অনন্ত অবিনশ্বরতার কথাই চিন্তা করে না যে ওদের মনে এরূপ বাসনার উদয় ঘটবে আর একদিকে সেই বাসনা পূরণের কল্পনা এবং অন্যদিকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভাবনা তাকে দংশন করতে থাকবে।

সত্যি, যদি এটাই স্থির হয় যে মানুষ ধ্বংসশীল, তাহলে একদিক থেকে তার চিন্তা-চেতনা ও মনের বাসনাসমূহ আর অপরদিক থেকে তার সাধ্য ও সামর্থ - এ দুয়ের মধ্যে আজব এক অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। এ প্রশ্ন জন্ম নেয় যে এ মরণশীল প্রাণীটি মৃত্যবরণ করবে তাহলে তার এসব সুবিস্তৃত সুদূর প্রসারী কল্পণা ও নেশাগুলো কতই না অনর্থক ও মর্মপীড়াদায়ক। কত মানুষ তাদের মৃত্যুর পরে স্বীয় নাম পরিচয় ও স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য কতই না চেষ্টা কসরৎ করে গেছে। এসবই জন্ম নিয়েছে তাদের এই অনুভব ও স্পৃহা থেকে। যদিও সে অযৌক্তিকভাবে মনে করে থাকে যে তার নামটি, বা মূর্তিটি বা তার স্মৃতি ফলকটি যদি তার মৃত্যুর পরে থেকে যায় তাহলেই সে অমর হয়ে থাকবে। তখন ধ্বংস বা নশ্বরতা তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। মানুষ এ পদ্ধতিতে অবিনশ্বর থাকার নিমিত্তে কত অপরাধযজ্ঞও সংঘটিত করে থাকে। কিন্তু কে আছে যে ঐ সময়ে জানবে না যে তার এসব প্রচেষ্টা অনর্থক ও নিস্ফল। আমি নিজে যদি ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই, তবে আমার নাম ও খ্যাতি আমার জন্য কি তৃপ্তি বয়ে আনবে? নাম, খ্যাতি, গৌরব ইত্যাদির তৃপ্তি তো তখনই উপভোগ্য হবে যখন আমি নিজে জীবিত ও টিকে থাকবো। একমাত্র যে জিনিসটি এ অনুভূতি ও এ চাহিদাকে সম্পূর্ণরূপে ও পুরোপুরিভাবে পূরণ করে থাকে তা হচ্ছে ধর্মীয় ভাবাবেগ ও বিশ্বাস তথা উপাসনা। বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিক্টর হুগো তার একটি চমৎকার ভাষণে বলেন ঃ সত্যি মানুষ যদি এরূপ চিন্তা করে যে সে হল অস্তিত্বহীন এবং এ জীবনের পরে নিস্তব্ধ নিরস্তিত্বই অপেক্ষমান, তাহলে মানুষের জন্য জীবনের আসলে কোন মূল্যই থাকবে না। যে জিনিসটি মানুষের জীবনকে তার কাছে বাঞ্ছিত ও তৃপ্তিদায়ক করে তোলে, তার কাজকে আনন্দময় করে, তার মনে সুখের উষ্ণতা এনে দেয়, তার দৃষ্টিসীমাকে দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত করে দেয় সেটা হচ্ছে সেই জিনিসটাই যা ধর্ম মানুষকে দেয়। অর্থাৎ অনন্ত জগতের প্রতি বিশ্বাস, চিরকালীন ও চিরস্থায়ী জীবনের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস যা বলে হে মানুষ! তুমি নশ্বর নও, অবিনশ্বর। তুমি এ বিশ্বের চেয়েও বড়। তোমার তুলনায় এ বিশ্ব একটি পাখির বাসার চেয়েও ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী। এ পৃথিবী নিছক একটি দোলনাস্বরূপ, যা তোমার শিশুবেলার জন্য মাত্র। কিন্তু তোমার জীবনের অন্য বেলাগুলো আরো বেশি প্রলম্বিত ও দীর্ঘ। মহামতি টলস্টয়কে প্রশ্ন করা হয় 'ঈমান' কি? এর সংগা আমাদের বলুন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ ঈমান হল সেই জিনিস যার সাথে মানুষ বেঁচে থাকে। তার জীবনের পুঁজি বা মুলধনই হল ঈমান।

সত্যিই অদ্ভুত এক সহজ বাক্য অথচ অর্থে ভরপুর। ঈমান হচ্ছে সেই জিনিসটা যার সাথে মানুষ জীবনযাপন করে। আপনি এ বাক্যটিকে নিয়ে তুলনা করে দেখেন এক দল সরল সাধারণ ও দেশদুনিয়া সম্পর্কে বেখবর লোকের চিন্তা পদ্ধতির সাথে। যারা মনে করে যে ধর্ম মানুষের জন্য কেবলই 'মাথার বোঝা'। আর ধর্মে বিশ্বাস না করাই এক ধরনের স্বাধীনতা ও নির্ভার হয়ে চলার সুযোগ! এরা মনে করে থাকে যে কোন কিছুর প্রতি দায় না রাখাটা তার নামই স্বাধীনতা। তাই বুদ্ধিবৃত্তি, মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা মর্যাদাবোধ এগুলোর কোন কিছুর প্রতি দায় না রাখা যেহেতু কোন কিছুর অধীনত না থাকারই পর্যায়ভুক্ত, অতএব সেটাই দায়মুক্তি ও স্বাধীনতা। কিন্তু এ রুশ মহাপুরুষ কতই না চমৎকারভাবে আধ্যাত্মিক মুলধন তথা পূঁজির বিষয়টি অনুধাবন করেছেন। তিনি এটা বলেননি যে ঈমান হচ্ছে 'মাথার বোঝা'। বরং বলছেন 'জীবনের মূলধন'।

ধর্ম নৈতিকতা ও আইনের পৃষ্ঠপোষক

মানুষের সমাজে প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে নৈতিকতা ও আইন। সমাজ নৈতিকতা ও আইন চায়। আবার আইন ও নৈতিকতার শুধুমাত্র ও একমাত্র পৃষ্ঠপোষকই হচ্ছে ধর্ম। যারা বলে ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই নৈতিকতা সুদৃঢ় থাকতে পারে তাদের এ কথা কখনোই বিশ্বাস করবেন না। এ কথা আর টাকার নকল নোটের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিম্বা পশ্চিমাদের ঘোষিত সেই মানবাধিকার সনদের মত যার বিরুদ্ধে সবার আগে তারাই আবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে অথবা করে যাচ্ছে। কিন্তু কেন এমন? কারণ তা মানুষের বিবেকের গভীর থেকে উৎসারিত ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। Georges Bidault যিনি একসসময় নিজে ফ্রান্সের স্যোসালিস্টদের নেতা ছিলেন যখন ফ্রান্স আলজেরিয়ার স্বাধীনতা দিতে চাচ্ছিল সেসময় তিনি যোগ দিলেন মানুষ হত্যাকারী সংস্থাগুলোর পক্ষে। কেন তোমরা আলজেরিয়ার স্বাধীনতা দিবে! জ্বি, এরাই হলেন মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষর কারীরা। আইনের বেলায়ও একই কথা। তাহলে স্বাধীনতা কেমন? স্বাধীনতাও কি এরূপ? মানব সমাজে যা কিছুই পবিত্র ও মহৎ যেমন ন্যায়পরায়নতা, সাম্য, মনুষ্যত্ববোধ, স্বাধীনতা, সমবেদনা ইত্যাদি যা কিছুই আপনার চিন্তায় আসুক না কেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত ধর্মের ছত্রছায়া না থাকবে ততক্ষণ তা সত্যে পরিণত হবে না। আলেক্সিস ক্যারেল বলেন ঃ মস্তিস্কগুলো খুবই অগ্রসর, কিন্তু আফসোস যে অন্তরগুলো এখনো দুর্বল ও অক্ষমই রয়ে গেছে।

অন্তরকে কেবলমাত্র ঈমান-ই শক্তিশালী করতে পারে। মানুষের সমস্ত ভোগান্তি এ কারণে যে মস্তিস্কগুলো শক্তিশালী হয়েছে। আর অন্তরগুলো এখনো দুর্বল রয়ে গেছে। সভ্যতা মানুষের জন্য কি করে? সভ্যতা মানুষের জন্য ভোগ্য উপকরণ নির্মাণ করে। ভাল ভাল উপকরণ সামগ্রী। ন্যায্যত বলতে হয় যে অত্যন্ত ভাল ভাল উপকরণ উদ্ভাবন করে। কিন্তু মানুষদের কি করে? কোন্ জিনিস মানুষদেরকে বদলাতে পারে এবং তাদেরকে পবিত্র ও মহান লক্ষ্য দান করতে সক্ষম হয়? কিইজনিস রয়েছে যা মানবের মূল্যবোধসমূহকে পরিবর্তন করে দিতে পারে? এমন কিছু করবে যাতে তার সহমর্মিতা ও কোমল মন মূল্যবান হয়ে উঠবে। মনুষ্যত্ব আর ধর্ম ও ঈমান হচ্ছে সমান সমান। যদি ধর্ম ও ঈমান না থাকে তাহলে কোন মনুষ্যত্বই নেই।

ধর্ম মানুষের সৌভাগ্যের কারণ

ধর্মের প্রধান উপকার হচ্ছে তা মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্য বয়ে আনে। ধর্মই সর্বযুগে সকল মানুষের জন্য অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে বেশি কার্যকর এবং মানুষের সৌভাগ্যের একমাত্র পথ। সন্ধি ও শান্তি কেবলমাত্র ধর্মের ছায়াতলেই উৎপত্তি লাভ করে এবং ধর্মই মানুষের আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত করে। আন্দোলন সংগ্রামও ধর্মের অনুপ্রেরণা দ্বারাই এগিয়ে যায়। একারণে বিশ্বের তাবত সংগ্রামী নেতাগণ ও প্রতাপশালী রাষ্ট্রনায়কগণ সর্বদা ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়-ব্যাপারের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ধর্ম হল নৈতিক ও সামাজিক জীবনের কর্মপন্থা। সেটা ওহি সমর্থিত হোক বা না হোক। মানুষকে এক শ্রেণীর নিয়ম নীতি ও কর্মধারা শিক্ষা দেয় যা ইবাদত বা উপাসনা হিসাবে পালনীয়। হোক না উপাস্য স্বয়ং আল্লাহ অথবা দেবতাগণ কিম্বা আত্মাসমূহ অথবা কিছু প্রাকৃতিক প্রতিকৃতি। একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসই মানুষকে একজন সত্যিকার ঈমানদারে পরিণত করতে পারে। এ ঈমান ও আচরণ একদিকে যেমন তার আত্মস্বার্থ ও আত্মপূজাকে ম্লান করে দেয়, অপরদিকে তেমনি তার মধ্যে এক প্রকার আত্মবিনয়ী ও আত্মসমর্পী মানসের জন্ম দেয়। এমন হয়ে যায় যে, ধর্ম ক্ষুদ্রতম বিষয়টিও যখন তার সামনে উপস্থাপন করে তখন সে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রশ্রয় দেয় না। পরম ভক্তি ও মূল্যবান বিষয় হিসাবে তা গ্রহণ করে নেয় এবং সেটা ব্যতীত তার জীবনই অনর্থক ও মূল্যহীন হয়ে ওঠে। একধরনের পৌরুষ ও অসহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে সে তা সমর্থন করতে থাকে।

ধর্মীয় বিশ্বাসপরায়ণ আকর্ষণ ও ঝোঁকগুলোর কারণে মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ঝোঁকগুলোকে উপেক্ষা করে চলে। কখনো কখনো নিজের অস্তিত্ব ও সম্ভ্রমকে স্বীয় ঈমান তথা বিশ্বাসের পথে উৎসর্গ করে দেয়। এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষের অইডোলজি পবিত্র ভাবলেশ পরিগ্রহ করে এবং মানুষের অস্তিত্বের উপর নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। আর একমাত্র ধর্মীয় শক্তিই আইডোলজিকে পবিত্র ভাবমূর্তি প্রদান করতে সক্ষম হয় এবং উক্ত আদর্শের বিধানগুলোকে পূর্ণ শক্তি সহকারে মানুষের উপর জারি করতে সক্ষম হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাস তথা ঈমানের উপকারিতা অনেক। মানুষের জীবনে ধর্মের অবদান অসামান্য। ব্যক্তিজীবনে প্রফুল্লতা ও প্রশস্ততা আনয়নের দিক থেকে যেমন, সামাজিক সম্পর্কগুলোকে নির্মল ও নিস্কলুষ করার দিক থেকেও তদ্রূপ। তাছাড়া দুঃখ-কষ্ট ও শোক-তাপ যা এ পার্থিব জীবনের অনিবার্য সঙ্গী, সেগুলো হ্রাস বা দূর করার ক্ষেত্রেও ধর্মই বড় আশ্রয়, এমনভাবে যে ধর্ম সামগ্রিক অর্থে আমাদের বিশ্বদৃষ্টিকে বদলে দেয়। ওহির নূর যে জগত আমাদের কাছে উপস্থাপন করে সেটা এজগতই, তবে এর চেয়ে অনেক বেশি উপাদান ও উপকরণ সমৃদ্ধ। যেমন ওহি ঘোষণা করে ঃ سبح لله ما فى السموات و الارض- 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহীমা ঘোষণা করে।' (হাদীদ ঃ ১) অর্থাৎ বিশ্বজগতের প্রতিটি অণুকণা আল্লাহর মহীমা ঘোষণায় ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না।

আয়াতুল্লাহ শহীদ মোতাহ্হারী 'ঈমানে মাযহাবী' বইতে লিখেন ঃ মানুষ আইডোলজি, লক্ষ্য ও ঈমান ধারণ করা ব্যতীত সুষ্ঠু জীবনের অধিকারী হতে পারে না কিম্বা মানবজাতির ও মানবসভ্যতার জন্য কোন উপকারী ও ফলদায়ক কাজ করতে সক্ষম হয় না। যে মানুষ কোন প্রকার আইডোলজি ও ঈমান রাখে না সে হয় কোন আত্মস্বার্থে নিমজ্জিত জন্তুর ন্যায় হয়ে ওঠে (অর্থাৎ কচ্ছপ যেমন তার পিঠের উপরিস্থ শক্ত আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, ঐ মানুষটিও তদ্রুপ আত্মস্বার্থের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারে না), আর না হয় এমন এক উদভ্রান্ত ও ভবঘুরে মানুষে পরিণত হবে যে জীবনে এবং নৈতিকতা ও সামাজিক অঙ্গনে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের খবর রাখে না। মানুষকে উঠতে বসতে নৈতিক ও সামাজিক বিষয়সমূহের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে অগত্যা তাকে এসব বিষয়ের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয়। এক্ষেত্রে সে যদি কোন আদর্শ এবং আকীদার প্রতি বিশ্বাসী থাকে তাহলে তার কর্তব্য স্পষ্ট। কিন্তু যদি কোন আদর্শ ও আকীদা তার কর্তব্য স্পষ্ট

না করে থাকে তাহলে সে সর্বদা দ্বিধান্বিত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে থাকবে। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসই মানুষকে একজন প্রকৃত ঈমানদারে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

একটি ধর্মীয় আইডোলজির সাথে অধর্মীয় আইডোলজির পার্থক্য এটা যে যখন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রশ্ন আসবে এবং আইডোলজিকে পবিত্র রূপ দান করবে তখন সমস্ত আত্মত্যাগই পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে ও স্বাভাবিকভাবে নিস্পন্ন হবে। কাজেই যে কাজ ঈমান ও চিত্তের সন্তোষক্রমে সংঘটিত হয় যা একপ্রকার স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বেছে নেওয়ার শামিল, তার সাথে ঐ কাজের ঢের তফাৎ যা মনের ভেতরকার ক্লেদ ও কষ্টপ্রসূত চাপের ফলে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেকাজ বিবেচনা প্রসূত নির্বাচন নয়, বরং অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ।

দ্বিতীয়ত, মানুষের বিশ্বদৃষ্টি যদি কেবলই বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গী হয় এবং ইন্দিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে যে কোন প্রকার আদর্শবাদিতা এবং সামাজিক ও মানবিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লালন করাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগতের পরিপন্থী, যেগুলো সে ঐ সময় জগতের সাথে নিজের সম্পর্কের মধ্যে অনুভব করে থাকে।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিশ্বদৃষ্টির ফলাফল হল আত্মপূজা, আদর্শপূজা নয়। আদর্শ পূজা যদি এমন একটি বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় যা ঐ আইডোলজিরই যৌক্তিক ফল, তাহলে তা কল্পনাচারিতার সীমা অতিক্রম করতে পারে না। অর্থাৎ মানুষকে এমন একটি জগত বিনির্মাণ করতে হবে যা হবে তার নিজের অভ্যন্তরস্থ বাস্তবতাসমূহ ও নিজের কল্পনা থেকে পৃথক এবং তা নিয়েই সে সুখী থাকবে। কিন্তু যদি আদর্শপূজা জন্ম নেয় ধর্ম ও দ্বীন থেকে, তাহলে সেটা হবে এমন এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত যার যৌক্তিক ফল হল আইডোলজিসমূহ ও সামাজিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের অনুসরণ। ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে মানুষ ও জগতের মধ্যকার বন্ধুত্বের এক সেতুবন্ধন। অন্যকথায় বলা যায়, তা হচ্ছে মানুষ ও বিশ্বজাহানের সামগ্রিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাঝে এক প্রকার সমন্বয় ও সামঞ্জস্যতা। কিন্তু অধর্মীয় বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ হচ্ছে জগত থেকে একপ্রকার বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা এবং নিজের জন্য একটি কাল্পনিক জগত নির্মাণের তুল্য যা কোনক্রমেই উর্ধ্বজগত থেকে সমর্থন ও পৃষ্টপোষকতা লাভ করে না।

ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জন্য তার প্রাকৃতিক ঝোঁক-প্রবণতা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর কর্তব্যই শুধু নির্ধারণ করে দেয় না, বরং জগতের চেহারাকেও তার দৃষ্টিতে বদলে দেয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানসমূহ ছাড়াও আরো কিছু উপাদান এ বিশ্বজগতের গঠন কাঠামোর

মধ্যে তাকে দেখায়। ফলে এ নিরেট, শুস্ক, শীতল যান্ত্রিক ও বস্তুগত জগতকে একটি প্রাণময়, চেতনাশীল এবং অবগত জগতে পরিবর্তন করে দেয়। ধর্মীয় বিশ্বাস জগত ও সৃষ্টিচরাচর সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধিকে পাল্টে দেয়। সুতরাং যেহেতু মানুষের আউডোলজি, ঈমান এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ধারণ করার আবশ্যকতা রয়েছে এবং অপরদিকে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসই মানুষকে সত্যিকার অর্থে স্বীয় প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয় এবং তৃতীয়ত মানুষ তার স্বভাবগত তাড়নায় এমন এক জিনিসের অনুসন্ধান করে ফেরে যেটাকে সে পবিত্র জ্ঞান করবে এবং উপাসনা করবে, অতএব একমাত্র পথ হল এটা যে ধর্মীয় বিশ্বাসকেই শক্তিশালী করতে হবে।

পবিত্র কোরআন হচ্ছে সর্বপ্রথম গ্রন্থ যা প্রথমত সুস্পষ্টরূপে ধর্মীয় বিশ্বাসকে সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে একপ্রকার সামঞ্জস্যশীল হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ افغير دين الله يبغون و له اسلم من فى السموات و الارض - 'তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করে? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে!' (আলে ইমরান ঃ ৮৩)

দ্বিতীয়ত ধর্মীয় বিশ্বাসকে মানুষদের স্বভাব-প্রকৃতির অংশ হিসাবে পরিচয় দান করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ فاقم وجهک للدين حنيفا فطره الله التى فطر الناس عليها -' অতএব তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন...'। (রূম ঃ ৩০)

ওস্তাদ শহীদ মোতাহ্হারী অন্যত্র বলেন ঃ এই যে বস্তুবাদীরা এবং ধর্মবিরোধীরা বলে থাকে ধর্ম হচ্ছে সমাজের আফিমস্বরূপ, নেশাসৃষ্টিকারী, স্থবিরতা ও পশ্চাদপদতার কারণ, অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্যের ব্যাখ্যাকার, অজ্ঞতার প্রহরী আর গণমানুষকে নেশায় বুদ্ কারী, তাদের এসব কথা সঠিক। তবে সেটা ঐ ধর্মের বেলায় যে ধর্ম শাসনের নামে শোষণ করে, শির্কের প্রচার করে আর বিভেদ-বৈষম্যের প্রচলন ঘটায় এবং ইতিহাসকাল জুড়ে যে ধর্ম আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। আবার তাদের এসব কথা মিথ্যাও, তবে সত্য ধর্মের বেলায়, যে ধর্ম একত্ববাদের, যে ধর্ম শোষিত ও নির্যাতিত মানুষদের, কিন্তু সবসময় যা জীবনের অঙ্গন থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থতালিকা ঃ

১. *ওস্তাদ মোতাহ্হারী ভা রওশনফেকরন*
২. *ইসলাম ভা মোক্তাযাইয়াতে যামন*, ১ম খণ্ড
৩. *মোকাদ্দামেহ-ই বার জাহনবিনি-এ ইসলামী*, ১ম খণ্ড

বিশেষ নিবন্ধ

ইসলামী চিন্তাধারায়
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি ও অবস্থান

ইসলামী চিন্তাধারায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি ও অবস্থান

মাহদী আযিযান ও রহিম লুতফী

মতভিন্নতা এবং চিন্তার বৈচিত্র্যের বিষয়টি আধুনিক ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম গবেষণার একটি বিষয়। চিন্তা ও মতের বহুত্বকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কারণ, এ বিষয়টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন বাস্তবতার দৃষ্টিতে, পরিচিতি বিজ্ঞান ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে, রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকার দৃষ্টিতে, সকল ধর্মাবলম্বীই সত্যপন্থী হওয়া অথবা সকল ধর্মাবলম্বীই মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি। এ দিকগুলোর মধ্য থেকে এ প্রবন্ধে যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এখানে এ অর্থে আমরা ব্যবহার করব যে, সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধর্ম ও চিন্তাধারাকে স্বীকৃতি দান করা অর্থাৎ সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মধ্যে যে সকল দিকে মিল রয়েছে সেগুলোকে গুরুত্ব দান করে তাদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ও বৈপরীত্য রয়েছে তা থেকে দূরে থাকা। বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতের লোকেরা একে অপরকে সহনশীলতার দৃষ্টিতে দেখবে এবং পরস্পরের অধিকারকে রক্ষার প্রচেষ্টায় ব্রত হবে।

Oxford অভিধানে চিন্তার বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে[১] এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে :

এমন এক সমাজে বাস করা যে সমাজটি বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে অথবা যে সমাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ধর্মের মানুষ বাস করে এবং তারা

১. Pluralism

এ বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে। এ মৌলনীতিটি মেনে নেয়াই হলো চিন্তার বৈচিত্র্য ও মতের বিভিন্নতা।[১]

যেহেতু বিভিন্ন মত ও চিন্তাধারার সহাবস্থানকে মেনে নেয়ার আবশ্যিক একটি দিক হলো পরস্পরের মতপার্থক্যের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন সেহেতু কখনও কখনও একে সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতাও নামকরণ করা হয়। এটাকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমার্থক অর্থেও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

এ লেখাটিতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সহনশীলতাকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আমরা ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ইতিহাস এবং এ মতের ভিত্তি ও দর্শন নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা অপরিহার্য মনে করছি।

১. ঐতিহাসিক পরিক্রমা

পাশ্চাত্য জগতে প্রথম পর্যায়ে সহনশীলতার বিষয়টি ধর্মীয় বিষয়েই উত্থাপিত হয়েছিল। যেমন প্রাচীন গ্রীসে বিভিন্ন উপাস্য এবং বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিদ্যমানতার কারণে কোন ধর্ম ও উপাস্যের অনুসারীরাই অন্যদের সমালোচনা ও কর্মের প্রতিবাদ করত না যদিও তারা পরস্পরের আচার-অনুষ্ঠানকে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মনে করত না। অবশ্য একই সময়ে রোমানদের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে দুই ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হতো। কখনও তারা খুবই সহনশীলতার পরিচয় দিত আবার কখনও তারা ছিল খুবই অসহিষ্ণু ও প্রতিপক্ষকে একেবারেই সহ্য করত না।

মধ্যযুগে যখন খ্রিস্টধর্ম রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে তখন পাশ্চাত্য সমানে অসহনশীলতা ও সহিংস আচরণ সমগ্র সমাজের ওপর কারো ছায়া ফেলেছিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাশ্চাত্য সমাজ (অবাধ) স্বাধীনতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মের হস্তক্ষেপকে রোধ, রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রভাবকে সীমিতকরণ, অধিকারকে কর্তব্যের ওপর প্রাধান্য দান ইত্যাদি বিষয়গুলো উত্থাপিত এবং জনসাধার ব্যাপকভাবে এ ধরনের চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকে পড়ে। গির্জা ও পাদ্রিদের পক্ষ থেকে জনগণের চিন্তা-

১.

বিশ্বাসসহ সকল বিষয়ে গোপন অনুসন্ধান ও হস্তক্ষেপ করা হতো এবং বিরোধীদের চিহ্নিত করে চরম শাস্তি দেয়া হতো। ফলশ্রুতিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিকভাবে করণীয় ও বর্জনীয় অধিকারমূলক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছিল। মধ্যযুগের চরমপন্থী এরূপ এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিল সেটি অগাস্টিন যিনি বিরোধী চিন্তার যে কোন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেয়াকে বৈধ মনে করতেন। পাদ্রিদের এমন বিশ্বাস ছিল যে, নতুন কোন প্রথা ও চিন্তাধারার প্রবর্তনকারীকে প্রশ্রয় দেয়া ও তার প্রতি সহনশীলতা দান ধর্মীয় সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

মধ্যযুগের শেষ দিকের খ্রিস্ট সমাজকে চিন্তাধারার দিক থেকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে খ্রিস্টধর্ম নিজেকে একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত ধর্ম বলে গণ্য করত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৪৪৬ সালে রোমের গির্জার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় যে, খ্রিস্টানদের কেউই গির্জার বহির্ভূত নয়। তৃতীয় পর্যায়ে সকল ধর্মকে একই রূপ সম্মান প্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করে তবে এ শর্তে যে, ঐ ধর্ম বুদ্ধিবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধ মতের বিরোধী হতে পারবে না। চতুর্থ পর্যায়ে ভ্যাটিকানের নীতিনির্ধারক পরিষদ, এমনকি ধর্মবহির্ভূত বিশ্বাসকেও সম্মানার্হ ঘোষণা করে।

যা কিছু বলা হলো তা থেকে স্পষ্ট হয় পাশ্চাত্যে সহনশীলতার ধারণাটি ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং একটি মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে তা প্রথমে উপস্থাপিত হয়নি; বরং একটি সামাজিক প্রবণতা ও গণজাগরণের সাথে তার অধিক মিল ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা রেনেসাঁর যুগে মানবতাবাদ, বুদ্ধিকেন্দ্রিকতা ও যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাগত তাত্ত্বিক রূপ লাভ করে এবঙ ধর্মের বাইরে অন্যান্য গণ্ডিতেও এ ধারণা প্রবেশ করে। এ সময় থেকে সহনশীলতা– বিভিন্ন মত ও চিন্তাধারা বৈচিত্র্যকে নিঃশর্তভাবে একটি মৌলনীতি হিসাবে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জ্ঞান ও পরিচিতি বিজ্ঞানসহ ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সমানভাবে এ নীতিকে গ্রহণ করা হয়।[১]

এটা হলো পাশ্চাত্যে সহনশীলতার বিভিন্ন রূপ ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যেহেতু আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইসলামী শিক্ষার মধ্যে সহনশীলতার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা সেহেতু ইসলামী সংস্কৃতিতে এ বিষয়টির উপস্থিতির ইতিহাস নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে শুধু এ বিষয়টির অবতারণা

১. ফারহাঙ্গে ওয়াজেহহা, আবদুর রাসূল বায়াত, পৃ. ২১৬-২১৭

করতে চাই যে, ইসলাম যে অর্থে সহনশীলতাকে গ্রহণ করে তার অস্তিত্বের বিষয়টি সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে। অতঃপর মহানবী (সা.) তাঁর সমগ্র জীবনে তাঁর সুন্নাত ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে ঐ আয়াতসমূহের প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধারণাটির বাস্তব রূপ দান করেছেন। আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণের প্রত্যেকে তাঁদের জীবনে পরিবেশ ও পরিস্থিতির পার্থক্যের বিবেচনায় তাঁদের বাণী ও কর্মের মাধ্যমে কোরআন ও রাসূলের কর্মপন্থার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। পরবর্তীকালে ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও আলেমগণ কোরআন, সুন্নাত ও আকল থেকে সহনশীলতার রূপকে হস্তগত করেছেন এবং সরকার ও প্রশাসনের সাথে জনগণের আচরণ, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্য, ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধরত ও সন্ধিকারী জাতি ও গোষ্ঠীর সাথে আচরণকে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফতোয়া ও বিধানরূপে উপস্থাপন করেছেন।

সহনশীলতার নীতির ভিত্তি

সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে মেনে নেয়া ও স্বীকৃতি দেয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। জ্ঞান ও পরিচিতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুত্বকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দান, অস্তিত্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ মতকে বৈধতা দান, মানবতাবাদ ও বুদ্ধিকেন্দ্রিকতাকে মৌলনীতি হিসাবে গ্রহণ ইত্যাদি। অবশ্য এ কারণগুলোকে ব্যাখ্যা এবং তার সাথে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা এ প্রবন্ধের গণ্ডির বাইরে। এর জন্য স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা হওয়া আবশ্যক।[১]

যে বিষয়টি আমাদের প্রবন্ধের সাথে সম্পর্কিত তা হলো ইসলামী চিন্তাধারা ও দৃষ্টিতে সহনশীলতার মতটির ভিত্তি ও মৌলনীতির উপযুক্ততা ও বৈধতা।

বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের বৈধতার মতের পশ্চাতে বিদ্যমান দার্শনিক যে ভিত্তিগুলো রয়েছে তার মধ্যে জ্ঞান ও পরিচিতি বিজ্ঞান () গত দার্শনিক ভিত্তিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ দর্শনের ভিত্তিতে বলা হয় প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা আপেক্ষিক একটি বিষয় এবং মানুষের পক্ষে প্রকৃত বস্তু ও বাস্তবতাকে অনুধাবন ও হস্তগত করা সম্ভব নয়। যে কোন মতবাদের কথাই বলা হোক না তা কেল সত্যের একাংশকে ধারণ করে, পূর্ণ

১. দ্রষ্টব্য : আবদুর রাসূল বায়াত, ফারহাঙ্গে ওয়াজেহা, পৃ.

সত্যকে নয়। এ কারণে সকল মতাদর্শ ও ধর্মকেই সঠিক বলে স্বীকৃতি দেয়া উচিত এবং কোন ধর্ম ও মতকেই ভুল ও অসত্য বলে ঘোষণা করা যায় না। এ কথাটি সঠিক যে, বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ হলো সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সত্য বলে মেনে নেয়া। যদি বাস্তবতাকে বিভিন্ন বলে ধরে নেয়া হয় এর আবশ্যিক পরিণতি হলো সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দান। এখানে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হলো যদি বাস্তবতার বহুত্বকে মেনে না নেয়া হয় তবে কি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বিষয়টি অসম্ভব বিষয় বলে পরিগণিত হবে? অন্যভাবে বললে বিষয়টি কি এমন যে, আমরা কেবল জ্ঞান ও পরিচিতির ক্ষেত্রে বহুত্বকে বৈধতা দান করলেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে নতুবা নয়?

আমাদের দাবি হলো জ্ঞান ও চিন্তার বহুত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয়টি একতরফা মাত্র। অর্থাৎ জ্ঞান ও চিন্তার বহুত্বের বিশ্বাসের আবশ্যিক পরিণতি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হলেও সাংস্কৃতিক বহুত্বকে মেনে নেয়ার আবশ্যিক অর্থ এটা নয় যে, জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে বহুত্বকে স্বীকৃতি দান করা। হতে পারে এক সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত ও বাতিল চিন্তা, মত ও ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তারা সামাজিকভাবে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। এটা এ কারণে যে, কোন সমাজে বিভ্রান্ত চিন্তা ও আকীদার লোকদের উপস্থিতিকে নির্দিষ্ট আইন ও বিধানের অধীনে মেনে নেয়া এক বিষয় আর সব চিন্তা ও মত, এমনকি বিকৃত ও ভ্রান্ত হলেও তাকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দেয়া ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ কোন চিন্তা ও মত ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তি ও বিশেষ ধর্মের দৃষ্টিতে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে সামাজিকভাবে ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করে না।

এখানে আমরা সর্বজ্ঞানবাদ ও জ্ঞানগত বহুত্বের বিষয়টির সঠিকতা যাচাইয়ের আলোচনা ও বিতর্কে না গিয়ে এবং ইসলাম যে সবচেয়ে পূর্ণ ও সর্বশেষ ঐশী ধর্ম ও একমাত্র ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমেই যে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য নিশ্চিত হয় তা প্রমাণের দায়িত্ব অন্য প্রবন্ধ ও কালামশাস্ত্রের ওপর অর্পণ করে পূর্বেই ইসলামকে এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ধরে সাংস্কৃতিক বহুত্বের বিষয়টির অবতারণা করব।

প্রশ্ন হলো ইসলাম একক সত্য ধর্ম হিসাবে যে বিশ্বজনীন ও চিরন্তনতার অধিকারী তা কি সামাজিক জীবনে অন্য সকল রহিত ঐশী ধর্ম ও বিচ্যুত ধর্মগুলোর ওপর কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং বাস্তবত তাদের সকলদে ময়দান থেকে বিতাড়িত করতে চায়? না কি অন্য ধর্মগুলোকে স্বাধীনতা দান করে তাদের অস্তিত্বকে মেনে নেয় এবং এর ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করে? যদি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হয় তবে মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের সুষ্ঠু সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার জন্য কি কোন বিশেষ পরিকল্পনা ও বিধি প্রণয়ন করেছে?

এ লেখনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সমাজে মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত ও আদান-প্রদান সংঘটিত হয় তা রূপটি কি এবং ইসলাম এ ধরনের সামাজিক সম্পর্কের জন্য কি নীতিমালা প্রবর্তন করেছে? অন্য ভাবে বলা যায়, মুসলমান ও অমুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য ইসলামের নির্ধারিত সীমারেখাটি কি?

ইসলাম কি এ ক্ষেত্রে শর্তহীন সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেছে? নাকি সহনশীলতার বিশেষ রূপ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গণ্য করেছে? যদি এ ক্ষেত্রে বিশেষ নীতি থাকে তবে এর শর্তগুলো কি কি? আমরা চেষ্টা করব আমাদের আলোচনার মধ্যে এ প্রশ্নগুলোর জবাব দানের। একটি ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলিম দেশ বিভিন্ন অমুসলিম দেশের সাথে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কী ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখবে, একটি ইসলামী সরকার তার অধিবাসী অমুসলমানদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কিরূপ নীতিমালা প্রদান করে এবং এরূপ দেশে বসবাসকারী মুসলমান ও অমুসলমানরা একে অপরের অধিকার ও সম্মানকে কিভাবে রক্ষণ করবে– এ তিনটি দিক থেকে আমরা আলোচনা উপস্থাপন করব। এ আলোচনা থেকে আমরা উল্লিখিত বিভিন্ন রূপ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অলঙ্ঘনীয় মৌলনীতিটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে।

বক্ষমাণ প্রবন্ধে আমরা কেবল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী সমাজের সাথে অমুসলিম জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্কের রূপ নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্য এখানে আমরা এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপরিহার্য মনে করছি যে, এ প্রবন্ধটি ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় সামাজিকতার ওপর আলোকপাত করেছে, ধর্মীয় বিধিবিধান ও

আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। তাই এ প্রবন্ধে আমরা ইসলামী ফিকাহ ও আইনশাস্ত্রের বিধান বর্ণনা করব না।

ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বী জাতি- গোষ্ঠীর রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক

এ সম্পর্কটি বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। যেহেতু এ আলোচনার ক্ষেত্রটি বেশ ব্যাপক সেহেতু আমরা তার মধ্যে তিনটি মৌলিক বিষয়কে এ প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছি ও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করব।

১. চুক্তি রক্ষা ও প্রতিশ্রুতি পালন
২. জ্ঞানগত ও রাজনৈতিক আশ্রয় দান
৩. দূতদের নিরাপত্তা দান

১. চুক্তিরক্ষা ও প্রতিশ্রুতি পালন

চুক্তিরক্ষার অপরিহার্যতা সম্পর্কিত মূলনীতি পবিত্র কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চুক্তিসমূহ রক্ষা কর।' এ আয়াতের অনুরূপ অর্থের আয়াত ও হাদীসগুলো ইসলামের স্বীকৃত মৌলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এ মৌলনীতিটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সকল প্রকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে পালনীয় এবং ইসলামের অনেক শিক্ষার ভিত্তি বলে গণ্য।

সূরা তওবার প্রথম কয়েকটি আয়াত অন্য সকল সূরার বিপরীতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ছাড়া শুরু হয়েছে[১] এবং যেসব মুশরিক রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। অথচ এ তীক্ষ্ণ বাচনভঙ্গী ও ভাষার রুঢ়তার মধ্যেও আয়াতগুলোর মধ্যে কিছু আয়াতে একদল মুশরিকের কথা বলা হয়েছে। যারা মুসলমানদের সাথে রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন চুক্তিতে আবদ্ধ পবিত্র কোরআন মুসলমানদের এ ধরনের মুশরিকদের সাথে কৃত

১. যা মহান আল্লাহর বান্দার প্রতি অসীম দয়াশীল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

চুক্তি রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে। তবে এ শর্তে যে, তারাও কৃত চুক্তি পালনের ওপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। বলা হয়েছে :

কিভাবে মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট চুক্তি থাকতে পারে (যখন নিজেরাই চুক্তিভঙ্গ করতে বদ্ধ পরিকর)? তবে তাদের সাথে ভিন্ন যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়েছ এবং তারাও চুক্তি রক্ষায় সচেষ্ট ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। সেক্ষেত্রে তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর থাক। কারণ, আল্লাহ সংযমশীলদের ভালবাসেন। (সূরা তাওবাহ : ৪-৭)

মহানবী (সা.)-এর সমগ্র জীবন ও মৌলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ষষ্ঠ হিজরিতে যখন তিনি উমরার লক্ষে একদল সঙ্গীকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন তখন মুশরিকরা তাঁর পথরোধ করে এবং মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়। অবশেষে তিনি মুশরিকদের সাথে সন্ধি চুক্তি করেন। এ সন্ধিচুক্তিটি হুদায়বিয়া প্রান্তরে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের হাতে লিখিত হয় এবং 'হুদায়বিয়া সন্ধি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ সন্ধির একটি ধারা ছিল যদি কোন মুসলমান মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আসে তবে তাকে মক্কার মুশরিকদে কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিছু দিন পর আবু বাসীর নামে মক্কার এক মুসলমান মুশরিকদের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় নিল। মক্কার মুশরিকরা 'হুদায়বিয়ার সন্ধির' শর্তানুসারে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেয়ার জন্য পত্র দিল। মহানবী (সা.) আবু বাসীরকে ডেকে বললেন : 'হে আবু বাসীর! তুমি তো জান আমরা এ সম্প্রদায়ের সাথে যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি সে অনুযায়ী তাদের জন্য বিশেষ কিছু অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। আর আমাদের ধর্মে প্রতারণা ও চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তুমিসহ সকল নিপীড়িত অসহায়ের সঙ্গে আছেন এবং তোমাদের জন্য পথ খুলে দিবেন। সুতরাং তোমার জাতির কাছে ফিরে যাও।'

আবু বাসীর আল্লাহর রাসূলের কথায় আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল : ' হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে সেই মুশরিকদের হাতে সোপর্দ করতে চান যারা আমার ধর্মকে অপছন্দ করে ও আমাকে এ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় ফেলবে?' মহানবী (সা.) তার কথার

জবাবে তাঁর পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন আল্লাহ তোমার জন্য কো উপায় করে দিবেন।[১]

এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হল সেই ঘটনা যা 'হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি' স্বাক্ষরের বৈঠকে ঘটেছিল। তখনও মহানবী (সা.) ও মুশরিকদের প্রতিনিধির মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়নি এবং তার বিভিন্ন ধারা ও শর্তগুলো কেবল লিখিত হয়েছে। এমন সময় আবু জান্দাল নামের একজন মুসলমান যিনি মুশরিকদের হাতে বন্দি ছিলেন তার গলার বেড়ি ও হাতের শিকলসহ পালিয়ে সেই বৈঠকে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আগেই জেনেছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল হুদায়বিয়া প্রান্তরে অবস্থান করছেন তাই পালিয়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

যদিও রাসূল (সা.) তখনও সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেননি, কিন্তু যেহেতু পূর্বেই মৌলিকভাবে ঐ শর্তগুলো মেনে নিয়েছিলেন সেহেতু আবু জান্দালকে চরম নির্যাতিত অবস্থায় দেখেও মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন।[২]

যদিও সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল এবং তাদের প্রত্যেকে ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য মূল্যবান বিবেচিত হতেন, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর এ কর্মের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি ও চুক্তির প্রতি নিবেদিত থাকার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

কেন মহানবী (সা.) এরূপ করলেন এবং এর পিছনে ঐশী কি যুক্তি কার্যকর ছিল সে বিষয়ে বলা যায় : ইসলামের মহান শিক্ষা মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায় যে, তারা যেন একে অপরকে সহযোগিতা দান করে। আর এ পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোন ভৌগোলিক সীমা-পরিসীমা নেই। যে স্থানেই কোন মুসলমান ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের কারণে নির্যাতনের শিকার হয় তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া আল্লাহর ধর্মকে সাহায্য করার শামিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান ও আকর্ষণীয় বিষয় হল নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলমানকে সাহায্য করার মতো মহান দায়িত্ব পালনও এ শর্তের অধীন যে, যে জাতির সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি রয়েছে তার বিরুদ্ধে যেন তা না হয়। মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যে কাফের ও অমুসলমান রাষ্ট্রের এ মর্মে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে যে, একে অপরের স্বার্থ পরিপন্থী কোন কাজ করবে না

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩
২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২১

সে ক্ষেত্রে ইসলাম সে দেশের মুসলমানদের এমন সহযোগিতা দান যা ঐ অমুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যায়, এমনকি মুসলমানদের ধর্ম রক্ষার খাতিরে হলেও সঠিক মনে করে না।

পবিত্র কোরআন বলছে :

وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

'(কেবল) যদি তারা তাদের ধর্মের (প্রতিরক্ষার) জন্য তোমাদের সাহায্য কামনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব তবে তাদের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের (শান্তি ও অবিরোধীতার) চুক্তি রয়েছে।' (আনফাল : ৭২)

এ আয়াত থেকেই আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-এর গৃহীত পদক্ষেপের পেছনে নিহিত ঐশী যুক্তির ভিত্তি খুঁজে পাই এবং তাঁর কাজের রহস্য বুঝতে পারি। ইসলাম সামাজিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি নিবেদিত থাকার ক্ষেত্রে এতটা অগ্রসরতা ও স্পর্শকাতরতা দেখিয়েছে যে, মুসলমানদের বৈধ পক্ষপাতিত্ব ও স্বার্থরক্ষার ওপর একে প্রাধান্য দিয়েছে।

অবশেষে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুশরিকদের পক্ষ থেকে লঙ্ঘিত হয় যখন তারা মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এক গোত্রের (খুজায়াহ গোত্র) ওপর হামলা চালিয়ে তাদের অনেককে হত্যা করে।

চুক্তি ভঙ্গের কারণেই মহানবী (সা.) অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হন। মহানবী (সা.) আবু বাসীর, আবু জান্দালের মতো যে ব্যক্তিদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এ বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মুসলমানরা মহা আনন্দ ও উদ্দীপনা নিয়ে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করল। কিন্তু তাদের স্মৃতিতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে চরম নির্যাতিত হওয়ার চিত্রগুলো ভেসে উঠল। এ দৃশ্য স্মরণ করে সাহাবী সাদ ইবনে উবাদাহ একটি কবিতার মধ্যে তার প্রতিশোধ স্পৃহা এভাবে প্রকাশ করেছেন–

আজ হলো রক্তপাতের দিন

আজ হলো সম্মান ও সম্ভ্রম লাঞ্ছিত করবেন।

আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর এ কবিতার মধ্যে জাহেলী যুগের গোড়ামি, গোত্রীয় রোষ ও প্রতিশোধের স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করে সাদ ইবনে উবাদার হাত থেকে মুসলিম সেনাদলের ঝাণ্ডা নিয়ে তাঁর পুত্র কায়স ইবনে সাদের হাতে অর্পণের নির্দেশ দিয়ে এ ঘোষণা দানের নির্দেশ দিলেন–

আজ হলো দয়া ও করুণার দিন

আজ আল্লাহ কুরাইশদের (ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে) সম্মানিত করবেন।

রাসূল (সা.) তাঁর এ কর্মের মাধ্যমে এমন এক পথনির্দেশ দিলেন যা মুসলমানরা অনুরূপ ক্ষেত্রে যেন একটি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে।

এ বিষয়টি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন চুক্তির শর্তসমূহ স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলোর জন্য আবশ্যকভাবে পালনীয়। ইসলামের শিক্ষা এটাই যে, চুক্তি ভঙ্গ করা একটি অন্যায় ও নিন্দনীয় কাজ। কিন্তু যদি কোন পক্ষ নিজে থেকে চুক্তিভঙ্গ করে এর অর্থ সে আর চুক্তির শর্তগুলোর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়। এ রকম ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্যও তার প্রতি নিবেদিত থাকা বাধ্যতামূলক নয়; বরং তাদের অধিকার রয়েছে প্রতি পক্ষের অনুরূপ পদক্ষেপ নিবে।

বিশেষত যখন দেখা যাবে যে, প্রতিপক্ষ একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চলেছে এবং চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কিছুদিন পরই অযাচিত ও ঠুনকো অজুহাতে চুক্তির শর্তগুলোকে পদদলিত করছে তখন সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত রাখা সম্ভব হবে এবং বিশ্বশান্তির আশা করা যাবে?

যে কোন সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বিষয় পক্ষগুলোর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির প্রতি নিবেদিত থাকার ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন দল, রাষ্ট্রসমূহ এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে যে সকল চুক্তি বিদ্যমান তা মেনে চলাই শান্তি ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে। এ পক্ষগুলোর মধ্যে কোন এক দল বা গোষ্ঠীর কাজই যদি হয় চুক্তি ভঙ্গ করা তখন সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিশ্ব নিরাপত্তার বিষয়টি হুমকির সম্মুখীন হয়। তাই সামাজিক ও বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চুক্তি ভঙ্গকারী রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে

পড়ে। কিন্তু যখন কোন গোষ্ঠী বা দল এতটা বেপরোয়া থাকে যে, অন্যদের শান্তি ও নিরাপত্তাকে আদৌ মূল্য দেয় না এবং তাদের অধিকারগুলোকে পদদলিত করে নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, এ ধরনের নীতিবর্জিত প্রতিপক্ষ যেহেতু বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অন্তরায় সেহেতু তাদের কঠোরভাবে দমন করা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান সময়ে যখন বর্ণবাদী ও যায়নবাদী ইসরাইল তাদের আগ্রাসী মনোভাব ও স্বার্থের পরিপন্থী আন্তর্জাতিক কোন চুক্তির প্রতিই শ্রদ্ধাশীল নয় তখন কোন্ আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালা দিয়ে এ অবৈধ রাষ্ট্রের মানবতাবিরোধী অপকর্ম ও অপরাধসমূহের প্রতিরোধ করা সম্ভব? তাই এ রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করা ছাড়া কিভাবে মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা যাবে? এরূপ ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত আয়াতের বাণীর মর্ম অনুধাবন করা যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন :

'যখন তারা চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করে এর প্রতিশ্রুতির বিপরীত কাজ করে এবং তা ভঙ্গ করে তোমাদের ধর্মের বিষয়ে বিদ্রূপ করে তখন কুফরের নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। কারণ, তাদের সাথে আর কোন চুক্তিই নেই। সম্ভবত তারা (তোমাদের কঠোরতা দেখে) বিরত হবে। যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং (আল্লাহর) রাসূলকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা (সিদ্ধান্ত) নিয়েছে তোমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না? যখন তারাই প্রথম তোমাদের সাথে (বিরূপ আচরণ) শুরু করেছে।'

সাংস্কৃতিক বহুত্ব

এ আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো অস্বীকারকারীদের নেতাদের হত্যার নির্দেশটি তাদের কাফের হওয়ার কারণে জারি হয়নি; বরং তাদের চুক্তির প্রতি নিবেদিত না থাকা ও চুক্তি ভঙ্গ করার ফলশ্রুতিতে। আয়াতে ব্যবহৃত ..... শব্দটি ... শব্দের বহুবচন যার অর্থ শপথ ও চুক্তি। সুতরাং অবিশ্বাসী ও অমুসলিমদের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা অনুমোদিত একটি বিষয়। কিন্তু চুক্তি ভঙ্গকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেই হোক তার সাথে কোন অবস্থাতেই বাস করা যায় না; বরং বলা যায় কোন রাষ্ট্র সমাজই এ ধরনের দল বা ব্যক্তির সাথে সমঝোতায় পৌঁছতে ও চুক্তি হওয়ার পর নিশ্চিত থাকতে পারে না। যারা শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী কোন চুক্তি স্বাক্ষর করতে চায় না এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও এর শর্তগুলো মেনে চলে না; বরং স্বেচ্ছাচারিতার

পরিচয় দেয় তারা বিশ্ব, সমাজ ও মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর বলে বিবেচিত হয়। তাই এ ধরনের রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ও তাদেরকে নিশ্চি.... করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য এরূপ কঠোর পদক্ষেপ কেবল ঐ দলের বিরুদ্ধে যারা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার নেতৃত্ব দান করে সন্ত্রাস ও অশান্তির রাজত্ব কায়েম করে। এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতে কাফেরদের হত্যার বিষয়টি আসেনি; বরং অস্বীকারকারীদের নেতাদের হত্যার কথা উপস্থাপিত হয়েছে।

আয়াতটি থেকে এটাও বোঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক সম্পর্কের মানদণ্ড হলো চুক্তি ও শপথের ওপর বিভিন্ন পক্ষ প্রতিষ্ঠিত থাকা, এ ক্ষেত্রে পক্ষগুলোর মুসলমান হওয়ার কোন শর্ত নেই। কারণ, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার মূল ভিত্তি হলো সামাজিক চুক্তিসমূহের প্রতি নিবেদিত থাকা। এ ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষগুলো অবিশ্বাসী ও অমুসলমানও হতে পারে। এ থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

১. শান্তিকামী অধার্মিক ও অবিশ্বাসী দলগুলোর সাথেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বাঞ্ছনীয়।

২. যদি স্বধর্মীরাও যদ্ধংদেহী মনোভাবাপন্ন হয় এবং অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে তবে তাদের সাথেও কঠোর আচরণ করতে হবে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে হলেও এ কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে হবে।

এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে পবিত্র কোরআনের সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

১. শান্তিকামী অবিশ্বাসীরা : যে সকল কাফের মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়নি কোরআন কেবল তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে নির্দেশই দেয়নি; বরং তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতার সাথে সদাচরণে উপদেশ দিয়েছে :

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

'যারা তোমাদের সাথে ধর্মের বিষয়ে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহসমূহ থেকে বহিষ্কার করেনি আল্লাহ তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং ন্যায়পরায়ণ হতে নিষেধ করেন না। কেননা, আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।' (মুমতাহিনা : ৮)

এ আয়াতের ঠিক পূর্বেই কোরআন আশাবাদ ব্যক্ত করেছে যে, ভবিষ্যতে মুসলমান ও তাদের শত্রু অবিশ্বাসীদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে :

۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن تَجۡعَلَ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَ ٱلَّذِينَ عَادَيۡتُم مِّنۡهُم مَّوَدَّةٗۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٞۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٧

'আশা করা যায় যে, তোমরা ও তাদের (মুশরিকদের) মধ্যে, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, আল্লাহ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াময়।' (মুমতাহিনা : ৭)

এটা স্পষ্ট যে, আয়াতে যে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে তা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কখনই মুশরিকদের চিন্তা, বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও তাদের সাথে একাকার হয়ে মিশে যাওয়া এ ভালোবাসার উদ্দেশ্য নয়। আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহর অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াময় হওয়ার পাশাপাশি সর্বশক্তিমান হওয়ার গুণের উল্লেখের মধ্যে এ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে যে, কাফেরদের সাথে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্র্যপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি যেন মুসলমানদের দুর্বলতা ও নতজানু হওয়ার প্রমাণবাহী না হয়; বরং তার মধ্যেও যেন শক্তিমত্তার প্রকাশ থাকে। অন্য আয়াতে কাফেররা যদি নমনীয়তা দেখায় ও সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ করে তবে তাদের সন্ধির আহ্বানে সাড়া দেয়া বাঞ্ছনীয়। বলা হয়েছে :

۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١

'যদি তারা (মুশরিকরা) সন্ধি করতে চায় তবে তোমরাও তা মেনে নাও। আর আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। কেননা, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।' (আনফাল : ৬১)

একই অর্থে অপর একটি আয়াতে এসেছে :

فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلٗا ﴿٩٠﴾

'যদি তারা নিবৃত্ত হয় ও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের শান্তি প্রস্তাব দেয় তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদের তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয়ার অনুমতি দেননি।' (নিসা : ৯০)

আয়াতের 'আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন অনুমতি তোমাদের দেননি' অংশ থেকে বোঝা যায় এ অবস্থায় মুসলমানরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে কোনরূপ আক্রমণ চালানোর অধিকার রাখে না।

একই রূপ অর্থবহ অন্য একটি আয়াতে মুমিনদের ওপর কাফেরদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে :

وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلٗا ﴿١٤١﴾

'আল্লাহ মুমিনদের ওপর কাফেরদের কর্তৃত্বের পথ দেননি। (নিসা : ১৪১)

আমাদের ফিকাহ গ্রন্থসমূহে এ মৌলনীতিটি 'কাফেরদের আধিপত্যের নীতি' নামে প্রসিদ্ধ।

এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যদি উভয় পক্ষ পরস্পরের অধিকার রক্ষা করে চলে তবে মুসলমান ও অবিশ্বাসী উভয় পক্ষ থেকেই অনাধিপত্যের নীতি কার্যকর হবে। তারা যেন একে অপরের ওপর আধিপত্যের চেষ্টা না চালায় ও অপর পক্ষের অধিকার হরণ না করে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে তারা পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

কিন্তু যদি কখনও কাফেররা মুমিনদের অধিকারকে খর্ব করে ও তাদের জীবন ও সম্পদের জন্য হুমকির সৃষ্টি করে তখন মুমিনদেরও উচিত তাদের জীবন, সম্পদ ও অধিকার রক্ষার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। এজন্যই পূর্বোক্ত আয়াতের অব্যাহততায় বলা হয়েছে : 'যদি কাফেররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ থেকে বিরত না হয় এবং তোমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব না দেয় ও তোমাদের (নির্যাতন করা) থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে তাদেরকে যেখানেই পাও পাকড়াও কর এবং হত্যা

কর। এরই হলো তারা যাদের ওপর তোমাদের প্রকাশ্য আধিপত্য স্থাপন করার অনুমতি আমরা দিয়েছি।' (নিসা : ৯১)

এরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষমতার পাল্লা মুসলমানদের দিকে ভারী হয়ে যাবে এবং তারা সীমা লঙ্ঘনকারী কাফেরদের ওপর আক্রমণ চালানোর অধিকার পাবে। অতএব, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় 'অনাধিপত্যের নীতি' এবং যুদ্ধাবস্থায় 'স্পষ্ট আধিপত্যের নীতি' কার্যকর হবে।

২. যুদ্ধবাদী মুসলমান

যদি মুসলমানদের কোন দল ঔদ্ধত্য দেখায় এবং অন্যদের অধিকারকে পদদলিত করে তবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যাতে তারা শান্তি বিনষ্টকারী ও সীমা লঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

'যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দাও। যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয় তবে যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফয়সালা (সন্ধি) করে দাও। ন্যায়বিচার কর, কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।' (হুজুরাত : ৯)

সুতরাং কোরআন শান্তি বিনষ্টকারী ও সীমা লঙ্ঘনকারী মুসলমানদের সাথেও অমুসলমানদের শান্তিবিরোধী ও চুক্তি ভঙ্গকারী গোষ্ঠীর ন্যায় যুদ্ধের নির্দেশনা দিয়েছে। তেমনি শান্তিকামী মুমিন হোক বা কাফের তার সাথে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার ও

সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছে। কেননা, আল্লাহ যে ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন তা শান্তিকামী কাফেরদের সাথে সদাচরণের উপদেশের আয়াতেও উল্লেখ করেছেন।

এ আয়াতগুলোর ভিত্তিতে বলা যায়, সীমা লঙ্ঘনকারী (সে যেই হোক) এবং কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই দিয়েছে অর্থাৎ ইসলাম শান্তি বিনষ্টকারী (ও নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীনকারী) শক্তিকে দমনের জন্যই যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে। তাই ইসলাম শান্তি স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করে, যুদ্ধের জন্য নয়। যদি সারা পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করে এবং কোন অরাজকতা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব না থাকে তবে কোন যুদ্ধকেই ইসলাম অনুমোদন দেয় না।

এ থেকেই ইসলাম কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা এবং শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনের আহ্বান জানিয়েছে তা বোঝা যায়। পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি আমরা লক্ষ্য করি–

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ

'তাদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি এবং অশ্বরাজি প্রস্তুত রাখ যাতে এর মাধ্যমে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত রাখতে পার। আর তাদের ছাড়াও সেই দলকে যাদের তোমরা চেন না, কিন্তু আল্লাহ তাদের চেনেন (যে তারা ইসলাম ও তোমাদের শত্রু)।' (আনফাল : ৬০)

এ আয়াত অনুযায়ী মুসলমানরা যুদ্ধ বা অন্যদের পদানত করার জন্য যুদ্ধ সামগ্রী জমা ও প্রস্তুত করে না; বরং প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে তা করে অর্থাৎ শত্রুরা যেন কখনও ইসলামী ভূখণ্ডে আক্রমণ চালানোর দুঃসাহস দেখাতে না পারে। এর দর্শন হলো মুসলমানদের অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে যাতে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে না পারে ও তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন না চালায়। কখনই আগ্রাসন চালানো ও পেশীশক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইসলাম যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত হওয়ার আদেশ দেয়নি। বরং চুক্তির প্রতি প্রতিপক্ষকে নিবেদিত রাখা এবং শান্তি প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করার জন্যই এরূপ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান

ইসলামী দেশ ও সমাজের সাথে বিধর্মী রাষ্ট্র ও সমাজের মানুষদের সম্পর্কের অপর একটি ক্ষেত্র হলো কোন অমুসলমান ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুসলিম দেশ ও সমাজে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করে তারা দুভাগে বিভক্ত, প্রথম দল : সেসব কাফের আহলে কিতাব (ইহুদি, খ্রিস্টান...) ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) প্রদানের শর্তে সেদেশে বাস করে। ইসলামী সরকার এর বিনিময়ে তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যে চুক্তির ভিত্তিতে তারা ইসলামী সমাজে বাস করে সেটাকে 'জিম্মি চুক্তি' এবং তাদেরকে 'কাফের জিম্মি' হিসাবে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় দল : সেসব কাফের আহলে কিতাব নয় অথবা আহলে কিতাব হলে ইসলামী সরকারের সাথে জিম্মি চুক্তি স্বাক্ষর করেনি, এ ধরনের কাফেরদের 'কাফের হারবি' বলা হয়।[১]

ইসলামী আইন ও শরীয়ত অমুসলমানদের (কাফের হারবি) দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং নিরাপত্তা কামনার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রে বাসের অনুমতি দিয়েছে। এ ধরনের চুক্তিকে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'মুয়াহাদাহ' .... বা ইসতিমান .... এবং এরূপ কাফেরকে 'মুয়াহাদ' বা 'মুসতা'মান' বলা হয়। এরা হলো ঐ গোষ্ঠী যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর বন্দি হওয়ার পূর্বে অস্ত্র সংবরণ করে 'অনাক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

'যদি তারা বিরত হয় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধির প্রস্তাব দেয় তবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদের তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার অনুমতি দেননি। (সূরা নিসা : ৯০)

অন্যত্র বলেছেন :

১. ইসলাম ও হুকুকে মিলাল, আমিদ যানজানি, পৃ. ২০১

۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿٦١﴾

'যদি তারা সন্ধি করার প্রতি ঝুঁকে তবে তুমিও সন্ধির প্রতি নত হও এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর।' সূরা আনফাল : ৬১

কাফেরদের এ দলটি দু'ভাবে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে :

এক. ইসলামী সরকারের সাথে এ মর্মে সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করবে যে তারা এক বছরের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তা সহকারে শান্তিতে বসবাস করবে[১] এবং এক বছর পর জিম্মি চুক্তির আওতায় প্রবেশ করবে। তখন তারা 'কাফের জিম্মি' হিসাবে জিযিয়া প্রদান করবে।

দুই. যে কোন বয়ঃপ্রাপ্ত সুস্থ চিন্তার মুসলিম নাগরিক অমুসলিম ব্যক্তিকে বেসরকারিভাবে নিরাপত্তা দিতে পারে। এ নিরাপত্তা দান পদ্ধতি অত্যন্ত সরল। মৌখিকভাবে যদি কোন মুসলমান বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন কাফেরকে বলে : 'আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি' বা 'তুমি ইসলামের আওতায় জিম্মি হিসাবে নিরাপদ' অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে তাকে বুঝায় যে, সে নির্ভয়ে তার আশ্রয়ে থাকতে পারবে তবে এটুকুই যথেষ্ট।[২]

এ উভয় অবস্থাতেই অমুসলমান ব্যক্তি রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করবে। আর যদি সে ইসলামের বিষয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকেও নিরাপত্তা দেয়া হবে। এরপর সে হয় ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হবে অথবা গবেষণার পর নিজের গোত্র বা জাতির কাছে ফিরে যাবে।

কোন কাফের যদি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে অবহিত হওয়া ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে আসে তবে ইসলামী সরকার সেদেশে অবস্থানকালীন তার

১.

২. শারায়ে, কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ৮৯; আল-খারায়েজ, আবু ইউসুফ, পৃ. ১১৭; জাওয়াহের, কিতাবুল জিহাদ, আততারাফুস সালেস, উদাহরণস্বরূপ : কোন এক যুদ্ধে মুসলিম সেনাদল একটি দুর্গ অবরোধ করলে হযরত আলী যখন শোনেন একজন মুসলমান তাদের সকলকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তখন তিনি অবরোধ উঠিয়ে নেন। ইসলাম ও হুকুকে মিলাল, আমিদ যানজানি, পৃ. ২০৩

নিরাপত্তা দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। অতঃপর যখন তার গবেষণা শেষ হবে তখন তাকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ

'যদি কোন মুশরিক আল্লাহর বাণী শোনার জন্য তোমার আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও।'[১] সূরা তওবা : ৬

দূতদের নিরাপত্তা

অমুসলমান ব্যক্তিবর্গ এবং অমুসলিম কোন সরকারের প্রেরিত দূতরা বিশেষ আইনগত অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। একজন্য তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করা ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। মিথ্যা নবী দাবিকারী মুসাইলামা প্রথমে মুসলমান থাকলেও পরে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। সে মুরতাদ হওয়ার পর কয়েক ব্যক্তিকে মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করে যারা সকলেই তার মতো মুরতাদ ছিল।[২]

যদিও তারা মুরতাদ ছিল কিন্তু যেহেতু তারা দূত বলে গণ্য হতো তাই তিনি (সা.) তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন : আল্লাহর শপথ, যদি তোমরা দূত না হতে তবে তোমরা নিহত হতে এবং তোমাদের শিরোশ্ছেদের নির্দেশ দিতাম।[৩]

অন্য একটি হাদীসে তিনি দূত ও বন্দিদের হত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন : দূত এবং বন্দিদের হত্যা করা যাবে না।[৪]

সুতরাং অমুসলমান রাষ্ট্রসমূহের দূতরা ইসলামী রাষ্ট্রে কূটনৈতিক নিরাপত্তার অধিকারী। **অনুবাদঃ এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর**

---

১. সূরা তওবার এ আয়াতটির তাফসীরে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বেশ কয়েকটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। জাওয়াহিরুল কালাম, কিতাবুল জিহাদ, আততারাফুস সালিস অধ্যায়

২. যেহেতু রাসূল (সা.) তাদের থেকে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন এবং তারা নিজেদের মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছিল। এ অবস্থায় তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ডের বিধান প্রয়োগ হতো যদি না তারা দূত হতো। সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৭

৩. সুনানে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬, কিতাবুল জিহাদ, বাব-উন ফির রাসূল

৪. ওয়াসায়িলুশ শিয়া, কিতাবুল জিহাদ, আবওয়াবু জিহাদিল আদু, বাব ৪৪, হাদীস ২ ও ৩

প্রতিক্রিয়া

বেহেশতে হুর প্রাপ্তি প্রসঙ্গ

প্রতিক্রিয়া ⟹

আমি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার এক সহপাঠী রয়েছে যে নামায কালামের ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। ক্লাসের মেয়েদের সাথেও বেপরোয়া ইয়ার্কি আড্ডা করে। একদিন আমি তাকে এ বিষয়ে বোঝাতে গেলাম। অমনি সে চট করে আমাকে শুনিয়ে দিল- 'যারা আমাদেরকে মেয়েদের সাথে আড্ডা দেওয়ার কারণে দোযখের আগুনের ভয় দেখায়, তারা নিজেরাই আবার নামায পড়ে এ আশায় যে বেহেশতের হুরীদের সঙ্গ লাভ করবে।' এ কথা শুনে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। উত্তরটা 'প্রত্যাশা'র কাছ থেকেই শুনতে চাই। (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক)

প্রতিক্রিয়া ঃ আসলে এটা কোন প্রশ্ন নয়। বরং একটি অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছিত অপবাদ বলা চলে। এ ধরনের অপবাদ তাদের পক্ষ থেকেই পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রজ্ঞাপ্রসূত বিধি-বিধানের প্রতি আরোপ করা হয় যারা স্রষ্টা ও পরকালের প্রতি কোনই বিশ্বাস রাখে না। তদ্রূপ ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তারা যে শুধু অবগত নয়, তা নয়, উপরুন্ত বিরোধিতা ও শত্রুতাও করে থাকে। যেমনটা আপনার বক্তব্যের মধ্যে ইশারা করেছেন। এদের কাজ হল আকা-বাঁকা শব্দাবলী দ্বারা বাক্য সাজানো। যে বাক্যের আগাগোড়া গঠনই মিথ্যা ও অপবাদের কৌশলী ফর্মূলায় মোড়ানো। এর পেছনে একমাত্র অভিসন্ধি হল মানুষের দ্বীনি বিশ্বাস ও আদর্শিক জীবনদর্শনের মূলে কুঠারাঘাত করা। মহান আল্লাহ যারা খোদায়ী বিধি বিধান ও নিদর্শনাদির প্রতি অস্বীকার ও শত্রুতা প্রদর্শন করে আর সত্যপন্থীদের বিপাকে ফেলার জন্য মূল্যহীন কথাবার্তা বলে তাদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ۝٦ وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسۡتَكۡبِرٗا كَأَن لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيۡهِ وَقۡرٗاۖ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٧

অনুবাদ ঃ 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদের আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয় এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যখন ওদের নিকট আমার বাক্য পাঠ করা হয় তখন ওরা দম্ভ

ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেন ওরা তা শুনতে পায়নি। যেন ওদের কর্ণদ্বয় বধির। অতএব ওদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' - সূরা লোকমান, আয়াত ৬-৭

তবে তাদের প্রতি উত্তরস্বরূপ নয় বরং তাদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ঃ

১. মহান আল্লাহ ইসলামে কাউকে তার বিপরীত লিঙ্গের (নর কিম্বা নারী) থেকে ভয় দেখাননি। শুধু তাই নয়, বরং সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে তোমাদেরকে জোড়ায় জাড়ায় সৃষ্টি করেছি এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ভালবাসাকে (নারীর প্রতি তাগিদ সহকারে) আমি নিজেই তোমাদের জন্য সৌন্দর্যময় করেছি। বলা বাহুল্য, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ যদি স্বভাবজাত বাসনা সৃষ্টি না করতেন তাহলে এ টান ও আকর্ষণের কোন অবকাশ থাকতো না। তবে তিনি তাগিদ দিয়েছেন যে এসব বাসনা ও আকর্ষণ তোমাদের পার্থিব জীবনের বস্তুগত চাহিদা পুরণের জন্য মাত্র। কাজেই তোমাদের সে চাহিদা (বৈধ পথে) পূরণ করবে। কিন্তু ঐ চাহিদার কাছে বন্দী হয়ে পড় না এবং ঐ জৈবিক কামনার ক্রীতদাসে পরিণত হয়ো না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

অনুবাদ ঃ 'নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার এবং পছন্দসই ঘোড়া ও চতুস্পদ জন্তু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সমস্তই ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে।' - সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৪

মহান আল্লাহ স্পষ্টতই বলেছেন খোদায়ী নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটা হচ্ছে অন্যতম একটি নিদর্শন। প্রত্যেক জুড়ি তথা নর ও নারীর মধ্যে তিনি ভালাবাসা প্রদান করেছেন। মানুষ তার জুড়ির সংস্পর্শে প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু যারা শুধুমাত্র বাসনা পূরণ ও যৌনকামনার নেশায় হন্যে হয়ে বেড়ায় তারা নয়, বরং যারা চিন্তা ও চেতনা নিয়ে চলে তারাই এর অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। তারা বুঝতে পারে যে, তাদের নিজেদের কিম্বা অন্যদের এ প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন হাত নেই যে তারা আজকে এর নিয়ম কানুন স্থির করতে আসবে। বরং এই জোড়াত্ব এবং এই ভালবাসা ও আকর্ষণ সবই হচ্ছে সেই শক্তিশালী নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত যা

থেকে মানুষ আরও আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং তাঁর প্রতি আরো দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

অনৃবাদ ঃ 'আল্লাহর করুণার নিদর্শাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হল তোমাদের জন্য তোমাদের আপনসত্তা থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। যাতে তার নিকট তোমরা প্রশান্তি লাভ কর। আর তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও দয়া প্রদান করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন নিহিত রয়েছে।'

এরপর আবার আল্লাহ মানুষকে অনাচার ও ব্যভিচারের কারণে দোযখ দ্বারা ভয় দেখানোর আগে বিবেক, বুদ্ধি ও চেতনা দ্বারা তাকে ভয় দেখিয়েছেন।

২. কাজেই কামনা-বাসনাকে স্বয়ং আল্লাহই মানুষের মধ্যে স্থাপন করেছেন। তবে আল্লাহ, যিনি মানুষ ও বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তিনি নারী ও পুরুষের বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও হৃদতা তাদের একে অপর থেকে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তিকে (অন্য সকল বিষয়ের মতোই) একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও বিধানের আওতায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর ফলে বিষয়টি মানুষের ক্ষেত্রে শুধু যে তাকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে না, তা নয়, উপরুন্ত এটাই তার জন্য উৎকর্ষ ও পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। একারণে তিনি এ মর্মে 'বিবাহ'র বন্দোবস্ত রেখেছেন। আর যা থেকে তিনি বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সেটা হল বন্ধু বন্ধু খেলার নামে অনাচার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। যার কুফল আমরা চোখ খুললেই দেখতে পাই। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ওদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। এটা নয় যে বন্ধু বন্ধু খেলার ছলে ব্যভিচারের মাধ্যমে তোমাদের বাসনা পূরণ করবে (غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)।

৩. এবার আসা যাক মুমিনদের নামায প্রসঙ্গে যা নিজেকে এবং অন্যদেরকে অনাচার, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার থেকে বিরত রাখে। যারা বিরোধিতা কারী, তারা যেহেতু সবক্ষণ অনাচারে নিমজ্জিত, না কোরআন পড়েছে, না নামায কায়েম করেছে আর না তারা বেহেশত সম্পর্কে আপেল নাশপতি এবং হুরী ব্যতীত অন্য কিছু শুনেছে। একারণে তারা অনুমান করে যে মুমনিদের ইবাদত বন্দেগী ঐ নেয়ামতের জন্য, যা শুধু মাশুকের আপ্যায়নের দস্তরখানায় থাকে। স্বয়ং আপ্যায়নকারীর প্রতি অনুরাগ এবং তার সাথে মিলনের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা সেটা বুঝি কিছু নয়।

ইসলাম ও কোরআনের অনুসারীগণ এবং নামায কায়েমকারীরা জানে যে, মহান আল্লাহ বলেছেন «اقم الصلوة لذكرى» অর্থাৎ নামায কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য। আমার সাথে আলাপনের জন্য এবং আমার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জন্যই নামায। নামায মুমিনদের মি'রাজস্বরূপ। এ কারণে প্রত্যেক নামায আদায়কারী নামাযের শুরুতেই এ কাজের পেছনে তার নিয়্যত সম্পর্কে ব্যক্ত করে বলে : আমি এ নামায আদায় করছি قربة الى الله অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে। আজ পর্যন্ত এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যে কেউ নিয়্যাতের মধ্যে বলবে قربة لحورالعين অর্থাৎ আমি নামায আদায় করছি 'হুর-উল আইন' এর নৈকট্য লাভের জন্য।

৪. এতদসত্ত্বেও পবিত্র জীবন ও এর প্রতিদানের প্রতি প্রত্যাশী হওয়া খুবই আশাব্যঞ্জক ও অনুপ্রেরণা দায়ক হয়। এক্ষেত্রে বিরোধিতাকারীদের কথাটির অর্থ দাঁড়ায় এমন যেন তারা বলে : বেহেশতের ঐশ্বর্য ও সম্পদ লাভের জন্য এই দুনিয়ায় সুদ খায় না এবং বেহেশতের পবিত্র শরাব পান করার জন্য তারা এ দুনিয়ায় যা কিছু মাতাল করে দেয় তা পান করে না .. .. ইত্যাদি। এ কথায় হয়ত কোন দোষ নেই। বরং ভালই বলতে হয়। কিন্তু তাই বলে এটাকে অজুহাত বানিয়ে বলা যায় না যে বেহেশতে যেহেতু হুরীদের সাথে মেশা যাবে অতএব দুনিয়ায় যিনা করা যায়। অথবা বেহেশতে যেহেতু পবিত্র শরাব রয়েছে কাজেই দুনিয়াতে মদপান করা যায়। কিম্বা বেহেশতে যেহেতু ধন-ঐশ্বর্য রয়েছে কাজেই দুনিয়ায় যে কোন উপায়ে ধন- ঐশ্বর্য বানানো যায় হোক সেটা সুদ-ঘুষের মাধ্যমে কিম্বা ছিনতাই ডাকাতি ও লুটতরাজের মাধ্যমে। এটাই সেই ম্যাকিয়েভেলির সেক্যুলার দর্শন। যে দর্শনে মানুষ পশুর দেহের বেশি কিছু নয়। পশুসুলভ কামনা বাসনাগুলো পূরণ করাই মুখ্য, যেভাবেই হোক আর যে পন্থায়ই হোক না কেন। আর জীবন বলতে পার্থিব জীবনেই শেষ। এর বাইরে কোন জীবন কল্পনীয় নয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

অনুবাদ ঃ 'আর আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। তারা পশুর ন্যায়। বরং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়। তারাই উদাসীন।' -সূরা আল-আ'রাফ ঃ আয়াত নং ১৭৯

একজন মহান কোরআন গবেষকের ইন্তেকাল

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন

উস্তাদ মোহাম্মাদ রেযা ফারিদুনি পবিত্র কোরআনের একজন মহান গবেষক ও পণ্ডিত ছিলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি কোরআনের ওপর গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে দ্বীনি ছাত্র ও জ্ঞানান্বেষীরা অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করেছেন। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী ও একান্ত স্বকীয় ধারার যুক্তি যে কোন ছাত্রকে চমৎকৃত করত। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনত। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও অমায়িক স্বভাবের এ শিক্ষক ছাত্রদের পাল্টা যুক্তিকে সাদরে গ্রহণ করতেন। অতঃপর তাদের ধারণাতীত এক যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে তা খণ্ডন করতেন। তাঁর সকল যুক্তি ছিল কোরআননির্ভর। তিনি কোরআনের আয়াতসমূহের আবশ্যিক ও পরোক্ষ অর্থের ওপর খুবই গুরুত্বারোপ করতেন। তবে কখনোই তা মনগড়া মতে (তাফসীর বি রায়) পর্যবসিত হতো না। কারণ, তা থেকে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক সর্বজনীন অর্থটিই গ্রহণ করতেন। নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার আলোচনায় তিনি এ বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেককারী আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রবেশের পূর্বে ঐ আয়াতটির পূর্ববর্তী যে আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ নবীদের মহান চরিত্র নির্দেশক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলতেন যাতে তাঁদের নিষ্পাপতার পরিপন্থী বাহ্যিক অর্থকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি ছাত্রদের কাছে কেবল আয়াতের তাফসীরই করতেন না, বরং তাদেরকে তাফসীরের পদ্ধতিও শিক্ষা দিতেন।

তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দ্বীনি মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ না করলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে আয়াতুল্লাহ জাফর সোবহানী, আয়াতুল্লাহ আবুল ফাজল নাযাফী কুদ্‌সী এবং আয়াতুল্লাহ শেখ মোহাম্মাদ রেযা জাফারীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে তাঁর মূল শিক্ষক ছিলেন মরহুম শেখ হোসাইন নিকওয়াস্‌ফ।

আল্লাহর জন্য নিবেদিত এ মহান শিক্ষকের মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা। তাঁদের আদর্শেই তিনি নিজেকে প্রশিক্ষিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষেই তিনি একজন আদর্শ শিক্ষকের নমুনা ছিলেন। আমরা তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।